# ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়

জসীম উদ্দীন

# সূচিপত্র

রবীন্দ্র-তীর্থে ........................................ 2

অবন ঠাকুরের দরবারে ........................................ 54

নজরুল ........................................ 140

# রবীন্দ্র-তীর্থে

এতদিন পরে কিছুতেই ভালমত মনে করিতে পারিতেছি না, কোন সময়ে প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাম শুনি। আবছা একটু মনে পড়িতেছে, আমাদের গ্রামের নদীর ধারে দুইটি ভদ্রলোক কথা বলিতেছিলেন।

একজন বলিলেন, "অমুক কবি কবিতা লিখে এক লক্ষ টাকা পেয়েছেন।" সেই এক লক্ষ টাকার বিরাট অঙ্কের পিছনে কবির নামটি ঢাকা পড়িয়াছিল। তারপর কবির সঙ্গে মনের পরিচয় হইল 'প্রবাসী'তে তাহার জীবন-স্মৃতি পড়িয়া। অল্প বয়সের সেই কিশোর বেলায় আর একজন কিশোর কবির প্রথম জীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া সেদিন যে মিলন-লতাটি রচিত হইল, তাহাতে ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইয়া আমার সমস্ত জীবন অমোদিত করিয়াছে। কবি কোথায় রেলগাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, জানালার পথে দৃষ্টি মেলিয়া পথের পাশের প্রতিটি দৃশ্যকে কি ভাবে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, কোথায় অবস্থান কালে সকাল হইতে দুপুর দুপুর হইতে সন্ধ্যা সেখানকার প্রতিটি গাছ লতা পাতার দিকে কবি চাহিয়া থাকিতেম, পদ্মানদীতে বোটে বসিয়া মাত্র একবাটি দুধ পান করিয়া সারাদিন তিনি লিখিয়া যাইতেন, এই সব কত যে একনিষ্ঠ ভাবে অনুকরণ করিতাম সে কথা ভাবিলে আজ হাসি পায়।

তারপর বুঝিয়া না বুঝিয়া কবির বইগুলি যেখান যেখানে পাইয়াছি পড়িয়া গিয়াছি। সব বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভাল লাগিয়াছে। হয়ত কবির রচনায় যে অপূর্ব সুরের মাদক আছে, তাহারই পরশ আমার অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এখন

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পূর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়া কয়েক বৎসর কবির কবিতা ছাত্রদের পড়াইলাম, কিন্তু আগের মত কবিতার মাদকতার স্বাদ এখন পাই না। কিছু বোঝা যায় কিছু বোঝা যায় না—যে সব কবিতায় এই আলো-আঁধারীর ছায়ামায়া থাকে—বোধ হয় সেগুলিতে রসউপভোগের একটি অপূর্ব আস্বাদ থাকিয়া যায়।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমার বন্ধুর কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের 'ফানী' 'অচলায়তন' প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়া আসিয়া আমার কাছে গল্প করিয়াছেন। আমি : একান্ত মনে সেই সব গল্প শুনিয়াছি। কতবার যে কবিকে স্বপ্নে দেখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ভাবে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে।

পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া একবার কলিকাতা আসিয়াছি। পল্লী-বালকের কল্পনাও সেই কলিকাতা অপূর্ব রহস্যে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। শুনিতে পাইলাম, ঠাকুরবাড়িতে 'শেষ বর্ষণ' অভিনয় হইবে। আমি আট আনা দিয়া সর্বনিম্নের একখানা টিকিট কিনিয়া নির্দিষ্ট আসনে গিয়া উপবেশন করিলাম। তখনও অভিনয় আরম্ভ হয় নাই।

অভিনয়-মঞ্চটি একটি কালো পর্দায় ঘেরা। তাহার সামনে প্রকাণ্ড হলঘরে দর্শকেরা বসিয়াছে। এই গৃহের সব কিছুই আমার কাছে অপূর্ব রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। সামনে পিছনে, এধারে ওধারে, যে দিকে চাহি, আমার মনে হয়, আমি যেন কোন অপূর্ব স্বর্গরাজ্যে আসিয়াছি। আমার সামনের আসনগুলিতে নানা সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া চারিদিক নানা গন্ধচুর্ণে আমোদিত করিয়া কলিকাতার অভিজাত শ্রেণীর মেয়েরা যে কলগুঞ্জন করিতেছিল—আমার মনে হইল, ইহার চাইতে আকর্ষণীয় কিছু আমি আর

কোথাও দেখি নাই। সকলের পিছনে বসিয়াছিলাম বলিয়া আমার আর ও ভাল লাগিতেছিল। পিছন হইতে আমি সকলকেই দেখিতে পাইতেছিলাম। যদি বেশী দামের টিকিট কিনিয়া সামনের আসনে বসিতাম, সেদিন হয়ত আমি কিছুতেই এত খুশী হইতাম না।

বহুক্ষণ পরে সামনের মঞ্চের পর্দা উঠিয়া গেল। বর্ষাকালের যত রকমের ফুল সমস্ত আনিয়া মঞ্চটিকে অপূর্বভাবে সাজান হইয়াছে। সেই মঞ্চের উপর গায়ক-গায়িকা পরিবৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আসিয়া যখন উপবেশন করিলেন, তখন আমার সামনে উপবিষ্টা সেই রহস্যময়ীরা চাদের আলোতে জোনাকীদের মতো একেবারে ম্লান হইয়া গেল। গানের পরে গান চলিতে লাগিল। সে কী গান। পুরুষকণ্ঠে মেয়ে কণ্ঠে, কখনও উচ্চগ্রামে উঠিয়া কখনো একেবারে অস্পষ্ট হইয়া সুরের উপরে সুর বর্ষণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে গানের বিষয়বস্তু অনুসরণ করিয়া মূক অভিনেতারা মঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সুর ছবি আর পুষ্পগন্ধের অপূর্ব সমন্বয়। শ্রবণ-নয়ন-মন মুগ্ধকর অপূর্ব অভিনয়। তখনও ভদ্রঘরের মেয়েরা মঞ্চে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে অভ্যস্ত হয় নাই। দুটি মেয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া গানের বিষয়বস্তুটি জীবন্ত করিয়া তুলিতেছিল।

শেষবারের মত একটি মেয়ে শুকতারা হইয়া মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইল। কী অপূর্ব তাহার চেহারা! গানের সুর বাজিয়া উঠিল, “শুকতারা ঐ উঠিল আকাশে।” তারপর ধীরে ধীরে শুকতারা মঞ্চ হইতে চলিয়া গেল। একটি মনোমুগ্ধকর স্বপ্ন-জগৎ যেন আমার সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

এই ভাবে অভিনয় শেষ হইল। দর্শকেরা কেহই হাতে তালি দিল না। যে যাহার এত নীরবে আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কবি মঞ্চের উপর দাঁড়াইলেন। অনেকে আগাইয়া গিয়া কবিকে প্রণাম করিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কবিকে প্রণাম করিলাম না। এই রবীন্দ্রনাথ আমারই রবীন্দ্রনাথ। আর দশজনের মত তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া পথের দশজনের মধ্যেই আবার মিশিয়া যাইব, কবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো এমন নয়। আমি শুধু বদ্ধদৃষ্টিতে কবির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কবি সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে দু-চারিটি কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু তাহার মন যেন কোন সুদূর ধ্যানলোকে মগ্ন। এই দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে আমি আমার আশ্রয়স্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পরে কি করিয়া কবির ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল, তাহা পরে বলিব। আমি এম. এ. পড়িতে কলিকাতা আসিয়া ওয়াই, এম,সি এ হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। আমার রাখালী' আর 'নক্সীকাঁথার মাঠ' বই দুইখানি ইহার বহু পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু কিছু কবিখ্যাতিও লাভ করিয়াছি। মাঝে মাঝে আমি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে জোড়াসাঁকো যাই। এই উপলক্ষে ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের পাশের বাড়ি রবীন্দ্রনাথের। তিনি এখানে আসিয়া মাঝে মাঝে অবস্থান করেন। শান্তিনিকেতন হইতে গানের দল আসে। তাঁহাদের গানে অভিনয়ে সমস্ত কলিকাতা সরগরম হইয়া উঠে। আমার জানা-অজানা কতলোক আসিয়া কবির সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। আমি কিন্তু একদিনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করি না। আমার কবিতার বই দুইখানি বহু অখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিককে উপহার দিয়াছি। মতামত জানিবার জন্য কতজনের দ্বারস্থ হইয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বই পাঠাই নাই।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের তরুণ সাহিত্যিকদের সমালোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাদের পক্ষ লইয়া শরৎচন্দ্র ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সাহিত্যিক নানা প্রবন্ধ লিখিয়া নিজেদের সদম্ভ আবির্ভাব ঘঘাষণা করিয়াছিলেন। বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবিতা করিয়া লিখিলেন, সামনে যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথ রুধিয়া দাঁড়ান তবু আমরা আগাইয়া যাইব। এই আন্দোলনের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ শৈলজানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন লেখককে প্রতিভাবান বলিয়া স্বীকৃতি দান করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দিলীপকুমার, বুদ্ধদেব বসু রচিত কয়েকটি কবিতা কাঁচি-কাটা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইলেন। রবীন্দ্রনাথ সেগুলির প্রশংসা করিলেন। আমি যদিও কল্লোল-দলের একজন, আমার লেখা লইয়া কেহই উচ্চবাচ্য করিলেন না। মনে অভিমান ছিল, আমার সাহিত্যের যদি কোন মূল্য থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ একদিন ডাকিয়া আমাকে আদর করিবেন। ইতিমধ্যেই আমি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত হওয়া এখন আমার পক্ষে সব চাইতে সহজ, তবু ইচ্ছা করিয়াই তঁহার সামনে উপযাচক হইয়া উপস্থিত হই নাই। কিন্তু আড়াল হইতে যতদূর সম্ভব তাহার খবর লইতেছি।

সেবার রবীন্দ্রনাথের খুব অসুখ হইল। সারা দেশ কবিব জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। শঙ্কাকুল দেশবাসী অতি আগ্রহের সহিত প্রতিদিন খবরের কাগজে কবির স্বাস্থ্যের খবর লক্ষ্য করিতে লাগিল। জাতির সৌভাগ্য, কবি রোগমুক্ত হইলেন। আরোগ্য লাভ করিয়া কবি কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। সেটা বোধ হয় ১৯৩০ সন।

তখন আমার মনে হইল, বয়োবৃদ্ধ এই কবির সম্পর্কে অভিমান করিয়া দূরে থাকিলে জীবনে হয়তো তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইবে না। ক্ষণকালের অতিথি কখন যে ওপারের ডাক পাইয়া আমাদের এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন তাহা কেহ জানে না।

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার বন্ধু। দুই জনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়া একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে রওনা হইলাম।

অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি হইতে রবীন্দ্রনাথের ঘর তিন মিনিটের পথও নয়। এই এতটুকু পথ অতিক্রম করিতে মনে হইল যেন কত দূরের পথ যাইতেছি। আমার বুক অতি-আনন্দে দুরুদুরু করিতেছিল। ঘরের সামনে আসিয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া মোহনলাল ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি যেন কোন অতীত যুগের তীর্থযাত্রী। জীবনের কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া আজ আমার চির-বাঞ্ছিত মহামানবের মন্দিরপ্রান্তে আগমন করিয়াছি। ছবির উপরে ছবি মনে ভাসিয়া আসিতেছিল। এতদিন এই কবির বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছি, যাহা পড়িয়াছি, যাহা শুনিয়াছি সব যেন আমার মনে জীবন্ত হইয়া কথা কহিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে মোহনলাল আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমি যেন কোন কল্পনার জগতে প্রবেশ করিলাম। সুন্দর কয়েকখানি ছবি দেওয়ালে টাঙানো। এখানে সেখানে সুন্দর সুপরিকল্পিত চৌকোণা আসন। তাহার উপরে নানা রঙের ডাোরাকাটা বস্ত্র-আবরণ। সেগুলি বসিবার জন্য না দেখিয়া চোখের তৃপ্তি লাভের জন্য কে বলিয়া দিবে! এ যেন বৈদিক যুগের কোন ঋষির আশ্রমে আসিয়াছি।

তখন বর্ষাকাল। কদমফুলের গুচ্ছ গুচ্ছ তোড়া নানা রকমের ফুলদানীতে সাজান। আধ-ফোটা মোটা মোটা কেয়াফুলের গুচ্ছ কবির সামনে দুইটি ফুলদানী হইতে গন্ধ ছড়াইতেছিল। বেলীফুলের দু-গাছি মালা কবির পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছিল, বাংলা দেশের বর্ষাঋতুর খানিকটা যেন ধরিয়া আনিয়া এই গৃহের মধ্যে জীবন্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। চারিধার হইতে সব কিছুই মূক ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। কবি যদি আমার সঙ্গে কোন কথাই না বলিতেন তবু আমি অনুতাপ করিতাম না। এই গৈরিক বসন পরিহিত মহামানবের সামনে আসিয়া আজ আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। সালাম জানাইয়া কম্পিত হস্তে আমি নক্সীকাঁথার মাঠ আর রাখালী' পুস্তক দুইখানি কবিকে উপহার দিলাম। কবি বই দুইখানি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে তুমি বাংলা দেশের চাষী মুসলমানদের বিষয়ে লিখেছ। তোমার বই আমি পড়ব।"

প্রথম পরিচয়ের উত্তেজনায় সেদিন কবির সঙ্গে আর কি কি আলাপ হইয়াছিল, আজ ভাল করিয়া মনে নাই।

ইহার দুই-তিন দিন পরে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মধ্যম ছেলে অধ্যাপক অরুণ সেন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কবিকে বই দিয়ে এসেছিলে। আজ দুপুরে আমাদের সামনে কবি অনেকক্ষণ ধরে তোমার কবিতার প্রশংসা করলেন। এমন উচ্ছ্বসিতভাবে কারো প্রশংসা করতে কবিকে কমই দেখা যায়। কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, তিনি তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবেন।"

পরদিন সকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া আমি কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। কবি আমার বই দুইখানির প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েই তোমার বই দু'খানার উপর বিস্তৃত সমালোচনা লিখে পাঠাব। তুমি শান্তিনিকেতনে এসে থাক।

ওখানে আমি তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দেব।"

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম "এখানে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পড়ছি। শান্তিনিকেতনে গেলে তো পড়া হবে না।"

কবি বলিলেন, "ওখান থেকে ইচ্ছে করলে তুমি প্রাইভেটে এম, এ, পরীক্ষা দিতে পারবে। আমি সে বন্দোবস্ত করে দেব।"

আমি উত্তরে বলিলাম "ভাল করে ভেবে দেখে আমি আপনাকে পরে জানাব।"

কলিকাতায় আমার সব চাইতে আপনার জন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিলাম। তিনি আমাকে কলিকাতা ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "কবি যদি এত বৃদ্ধ না হতেন তবে আমি ওখানে যেতে বলতাম। কিন্তু কবি কতকাল বেঁচে থাকবেন, বলা যায় না। এখান থেকে এম, এ, পাশ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর। ওখানকার আশ্রয় পাওয়ার সৌভাগ্য দীর্ঘ কাল তোমার না-ও হতে পারে।"

আমার শান্তিনিকেতন যাওয়া হইল না। ইহার পর কবি আরও বার বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আজ অনুতাপ হইতেছে, এই সুদীর্ঘ বার বৎসর যদি কবির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিতাম, তবে জীবনে কত কি শিখিতে পারিতাম।

কবি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন। প্রায়-দুই মাস চলিয়া গেল। কবি আমার বই-এর সমালোচনা পাঠাইলেন না। কিন্তু কি ভাষাতেই বা কবিকে তাগিদ দিয়া পত্র লিখিব। বহু চেষ্টা করিয়াও কবিকে লিখিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। মোহনলালকে দিয়া কবিকে পত্র পাঠাইলাম। তখন কবি শান্তিনিকেতনে কি-একটা অভিনয় লইয়া ব্যস্ত। কবি একটা ছোট্ট চিঠিতে মোহনলালকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "জসীমউদ্দীনের কবিতার ভাব ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।"

কবির এই কথাগুলি বই-এর বিজ্ঞাপনে ছাপাইয়া সেই সময় মনে মনে খুবই বাহাদুরী অনুভব করিয়াছিলাম। নক্সীকাঁথার মাঠ ছাপা হইলে বাংলা দেশের বহু সাহিত্যিক ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। যাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে প্রস্তুত হইতে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই প্রসংসার পরে তাঁহারা আর সে বিষয়ে সাহসী হইলেন না। সাপ্তাহিক সম্মেলনীতে একজন প্রবীণ সাহিত্যিক নক্সীকাঁথার মাঠ'-এর সমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি কিছু কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু বইখানি যে খারাপ এ কথা বলিতে সাহস পান নাই।

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ যখনই কলিকাতা আসিয়াছেন, অবসর পাইলেই আমি গিয়া দেখা করিয়াছি। আমাকে দেখিলে কবি তাঁর বিগত কালের পদ্মাচরের জীবন লইয়া আলোচনা করিতেন।

তখন আমি বালুচর' বইয়ের কবিতাগুলি লিখিতেছি। ইহার অধিকাংশ কবিতাই ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। মাসিকপত্রে ইহার অধিকাংশ কবিতা ছাপা হয়। সমালোচকেরা বলিতে লাগিলেন, "তোমার কবিতা একঘেয়ে হইয়া যাইতেছে। ছন্দ পরিবর্তন কর।"

একদিন কবিকে এই কথা বলিলাম। কবি বলিলেন, "ওসব বাজে লোকের কথা শুনো না। যে ছন্দ সহজে এসে তোমার লেখায় ধরা দেয়, তাই ব্যবহার কর। ইচ্ছে করে নানা ছন্দ ব্যবহার করলে তোমার লেখা হবে তোতাপাখির বোলের মত। তাতে কোন প্রাণের স্পর্শ থাকবে না।"

'বালুচর' বইখানা ছাপা হইলে কবিকে একখানি পাঠাইয়া দিলাম। সঙ্গে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলাম, পড়িয়া আপনার কেমন লাগে অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া জানাইবেন। কবি এ পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি কলিকাতা আসিলে দেখা করিলাম। কবি বলিলেন, "তোমার বালুচর' পড়তে গিয়ে বড়ই ঠকেছি হে। 'বালুচর' বলতে তোমাদের দেশের সুদূর পদ্মাতীরের চরগুলির সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আশা করেছিলাম। কেমন চখাচখি উড়ে বেড়ায়, কাশফুলের গুচ্ছগুলি বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কতকগুলি প্রেমের কবিতা দিয়ে তুমি বইখানাকে ভরে তুলেছ। পত্রে এ কথা লিখলে পাছে রূঢ় শোনায় সে জন্য এ বিষয়ে কিছু লিখি নি। মুখেই বললাম।"

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা কবিতার সংকলন বাহির করেন, তখন এই বালুচর' বই হইতেই 'উড়ানীর চর' নামক কবিতাটি চয়ন করিয়াছিলেন।

'রাজারানী, নাটকখানি নূতন করিয়া লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার 'তপতী' নামকরণ করিলেন। একদিন সাহিত্যিকদের ডাকিয়া তাহা পড়িয়া শোনাইলেন। সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। একই অধিবেশনে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কবি সামনে নাটকখানা পড়িয়া গেলেন। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন সংলাপগুলি কবির কণ্ঠে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল। এই নাটক মহাসমারোহে কবি কলিকাতায় অভিনয় করিলেন। কবি রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ কি করিয়া প্রেমের অভিনয় করিবেন, তাঁহার সাদা দাড়িরই বা কি হইবে, অভিনয়ের পূর্বে এই সব ভাবিয়া কিছুই কূলকিনারা পাইলাম না। কিন্তু অভিনয়ের সময় দেখা গেল, দাড়িতে কালো রঙ মাখাইয়া মুখের দুই পাশে গালপাট্টা তুলিয়া দিয়া কবি এক তরুণ যুবকের বেশে মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তপতী' নাটকে রাজার ব্যর্থ প্রেমের সেই মর্মান্তিক হাহাকার কবির কণ্ঠমাধুর্যে আর আন্তরিক অভিনয়নৈপুণ্যে মঞ্চের উপর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই নাটকে রাজার ভূমিকাটি বড়ই ঘোরালো। নাটকের সবগুলি চরিত্র রাজার বিপক্ষে। সেই সঙ্গে সাধারণ দর্শক-শ্রোতার মনও বাহির হইতে দেখিতে গেলে রাজার উপর বিতৃষ্ণ। রাজা যে রানীর ভালবাসা পাইল না, তারই জন্য যে রাজার সব কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, একথা সাধারণ দর্শক শ্রোতা সহজে বুঝিতে পারে না। হয়ত সেইজন্য ইহা বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বেশীদিন টিকিল না। কিন্তু যাঁহারা গভীরভাবে এই নাটকটি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, রাজার ব্যর্থ জীবনের হাহাকারের মধ্যে নাটকলেখকের দরদী অন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ব্যাপারটি কবির অভিনয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই নাটক অভিনয়ের সাত-আট দিন আগে কবি দলবল লইয়া শান্তিনিকেতন হইতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আগমন করিলেন। প্রতিদিন মহাসমারোহে নাটকের মহড়া চলিল। বন্ধু মোহনলালের সঙ্গে লুকাইয়া আমি এই নাটকের মহড়া দেখিতে যাইতাম। তাহাতে লক্ষ্য করিতাম' নাটকটি অভিনয়ের উপযোগী করিতে কবি বিভিন্ন ভূমিকাগুলিকে কেবলই বদলাইয়া চলিয়াছেন। কবির নাটকে যাঁহারা অভিনয় করিতেন তাহাদিগকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইত। যে পর্যন্ত অভিনেতা মঞ্চে গিয়া না দাঁড়াইতেন, সে পর্যন্ত ভুমিকার পরিবর্তন হইতে থাকিত। মোহনলালের নিকট শুনিয়াছি, কোন অভিনেত্রী তাহার নির্দিষ্ট ভূমিকা বলিতে মঞ্চে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় কবি তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "দেখ, এইখানটিতে এই কথাটি না বলে ওই কথাটি বলবে।"

'তপতী' নাটক পরে শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের চার-পাঁচ দিন আগে কবি শিশির কুমারকে টেলিগ্রামে শান্তিনিকেতনে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া নাটকের কয়েকটি অংশ বদলাইয়া দিলেন। কবির সৃজনীশক্তি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে জানিত না। বিধাতা যেমন তাহারা অপুর্ব-সৃষ্টিকাব্য ধরণীর উপর আলো ছড়াছয়া আঁধার ছড়াইয়া নানা ঋতুর বর্ণসুষমা মাখাইয়া উহাকে নব নব রূপে রূপায়িত করেন, তেমনি কবি তাঁর রচিত কাব্য উপন্যাস ও নাটকগুলিকে বারম্বার নানাভাবে নানা পরিবর্তনে উৎকর্ষিত করিয়া আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। 'রাজারানী' নাটকের 'তপতী'-সংস্করণক বির এই সৃষ্টিধমীমনের অসন্তুষ্টির অবদান।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ হইতে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নাটকের অভিনয় হয়। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে, এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রম্পট করিয়াছিলেন। শেষ দৃশ্যে যেখানে নটীর মৃত্যুর পর ড্রপসিন পড়ার কথা –অর্ধেক ড্রপসিন পড়িয়া গিয়াছে, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ গায়ে একটা মোটা কম্বল জড়াইয়া মঞ্চে আসিয়া নটীর মৃতদেহের উপর দুই হাত শূন্যে তুলিয়া 'ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গেলেন। তখন হইতে নটীর পূজা শেষ দৃশ্যে এই পাঠটি প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার খাতা দেখিয়াছি। তাহাতে এত পরিবর্তন ও এত কাটাকুটি যে দেখিয়া অবাক হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি কিছুতেই যেন তৃপ্ত হইতে জানিত না। আজীবন তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকখানিতে তাহার মনের একান্ত যত্নের ছাপ লাগিয়া রহিয়াছে। লিখিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি অপরকে দিয়া নকল করান নাই। যতবার নকল করিতে হয় নিজেই করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বারেই সেই রচনার ভিতর তাঁহার সৃজনী-শক্তির অপূর্ব কারুকার্য রাখিয়া গিয়াছেন।

তপতী'র পরে নাটক রচনার নেশা রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া আমি পাড়াগাঁয়ের লোকনাট্য আসমান সিংহের পালার উল্লেখ করিলাম। কবি আমাকে বলিলেন, "তুমি লেখ না একটা গ্রাম্য নাটক।" আমি বলিলাম, "নাটক আমি একটা লিখেছি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ পড়ে বললেন, নাটক লেখার শক্তি তোমার নেই।" কবি জোরের সঙ্গে বলিলেন, "অবন নাটকের কি বোঝে? তুমি লেখ একটা নাটক তোমাদের গ্রাম দেশের কাহিনী নিয়ে। আমি শান্তিনিকেতনের ছেলে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করাব।"

আমি বলিলাম, "একটা প্লট যদি দেন তবে আর একবার চেষ্টা করে দেখি।"

কবি বলিলেন, “আজ নয়। কাল সকালে এসো।”

পরদিন কবির সামনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একথা-সেকথার পরে আমার নাটকের প্লট দেওয়ার কথা কবিকে মনে করাইয়া দিলাম।

কবি হাসিয়া বলিলেন, “তুমি দেখছি, ছাড়বার পাত্র নও। চোরের মন বোচকার দিকে।” নিকটে আরও দু-একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়া উঠিলেন। কবি প্লট বলিতে লাগিলেন—

“ধর, তোমাদের পাড়াগাঁয়ের মুসলমান মোড়লের ছেলে কলকাতায় এম, এ, পড়তে এসেছে। বহু বৎসর বাড়ি যায় না। এম, এ, পাশ করে সে বাড়ি এসেছে। বাবা মা সবাই তাদের পুরনো গ্রাম্য রীতিনীতিতে তাকে আদর যত্ন করলেন। কিন্তু ছেলের এসব পছন্দ হয় না। সে বলে, তোমরা যদি আমাকে এমন করে আদরঅভ্যর্থনা না করতে তবেই ভাল হত। আদর করেই তোমরা আমাকে অপমান করছ।

“ছেলেটির সঙ্গে গ্রামের অন্য একজন মোড়লের মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের কথা বাপ বলতেই ছেলে রেগে অস্থির। অমুকের মেয়ে অমুক—সেই ছোট্ট এতটুকু মেয়ে তাকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। গ্রাম্য চাষী হবে তার শশুর!

“মেয়েটির তখন অন্যত্র বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। পাকাদেখার দিন ছেলেটা মেয়ের বাড়িতে কি উপলক্ষে গিয়ে তাকে দেখে এলো। ছেলেবেলায় যাকে সে একরত্তি এতটুকু দেখেছিল আজ সে পরিপূর্ণ যুবতী। ছেলের মনে হল, এমন রূপ যেন সে আর কোথাও দেখেনি।

“বাপ ছেলেকে বড়ই ভালবাসেন। বাপ দেখলেন কিছুতেই ছেলের মন টিকছে না, তখন তিনি ছেলেকে গিয়ে বললেন, “দেখ, অনেক ভেবে দেখলাম, দেশে থাকা তোর পক্ষে মুশকিল। তুই কলকাতায় চলে যা। এখানকার জলবায়ু ভাল না। কখন অসুখ করবে কে জানে। মাসে মাসে তোর যা টাকা লাগে, আমি পাঠিয়ে দেব। তুই কলকাতায় চলে যা।।

“তখন ছেলে এক মস্ত বক্তৃতা দিল। কে বলে, এ গ্রাম আমার ভাল লাগে না? ছেলেবেলা থেকে আমি এখানে মানুষ। এ গাঁয়ের গাছপালা লতাপাতা সব আমার বালককালের খেলার সঙ্গী।

“বাপ তো “বাক। হঠাৎ ছেলের মন ঘুরে গেল কি করে? ছেলের কোন বন্ধুর মারফৎ বাপ জানতে পারলেন, যে-মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের কথা স্থির হয়েছিল তাকে দেখেই সে পাগল। তখন বাপ ছুটলেন মেয়ের বাপের উদ্দেশে। কিন্তু মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ের কথা পাকা। মেয়ের বাপ কথা বল্লাতে রাজি নয়।

“এবার গল্পটিকে ট্রাজেডিও করতে পার, কমেডিও করতে পার। যদি ট্রাজেডি করতে চাও,লেখ, বিয়ের পরে মেয়েটির সঙ্গে আবার একদিন ছেলেটির দেখা। মেয়েটি ছেলেকে বলল, আমাদের যাকিছু কথা রইল মনে মনে। বাইরের মিলন আমাদের হল না কিন্তু মনের মিলন থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না।”

কবির এই প্লট অবলম্বন করিয়া আমি নাটক রচনা করিয়াছিলাম দুই-তিনবার অদলবদল না করিয়া কোন লেখা আমি প্রকাশ করি না। কবি জীবিত থাকিতে তাহাকে তাই নাটক দেখাইতে পারি নাই। ‘পল্লীবধূ’ নাম দিয়া নাটকটি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত

হইয়াছে। ঢাকা বেতারে এই নাটক অভিনীত হইয়া শত শত শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছে। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতেন, এই নাটক তাহাকে উপহার দিয়া মনে মনে কতই না আনন্দ পাইতাম।।

অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে মাঝে মাঝে নন্দলাল বসু আসিতেন গুরুর সঙ্গে দেখা করিতে। সেই উপলক্ষে শিল্পী নন্দলালের সঙ্গে আমার পরিচয়। নন্দলাল শুধুমাত্র তুলি দিয়া মনের কথা বলেন, গুরুর মত কলমের আগায় ভাষার আতসবাজী ফুটাইতে পারেন না। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করিতে আমার খুব ভাল লাগত। আর্টের বিষয়ে ছবির বিষয়ে তিনি এত সুন্দর সুন্দর কথা বলিতেন যা লিখিয়া রাখিলে সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হইত।

কয়েকটি কথা মনে আছে। এখানে লিখিয়া রাখিল। “গাছের এক এক সময়ে এক এক রূপ। সকাল সন্ধ্যা দুপুর রাত্রি কত ভাবেই গাছ রূপ-পরিবর্তন করছে। শান্তিনিকেতনে আমার ছাত্রেরা গভীর রাত্রিকালে জেগে উঠে গাছের এই রূপ-পরিবর্তন লক্ষ্য করে।”

সুদূর মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছিল নন্দলালের এক ছাত্র। আর্ট ইস্কুলে পাঁচ-ছয় বৎসর ছবি আঁকা শিখিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় দুঃখ করিয়া নন্দলালকে বলিল, “আমি চলেছি আমাদের পাড়াগাঁয়ে, সেখানে আমার আর্ট কেউ বুঝবে না। বাকি জীবনটা আমাকে নির্বাসনে কাটাতে হবে।” নন্দলাল ছাত্রকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি গ্রামে গিয়ে দেখতে পাবে এক রাখাল-বালক হাতে ছুরি নিয়ে তার লাঠির উপরে ফুলের নক্সা করছে। তার গরু হয়তো তখন পরের ক্ষেতে ধান খাচ্ছে, এজন্য তাকে বকুনি শুনতে হবে। কিন্তু সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। সে একান্ত মনে তার লাঠিতে ফুল তুলছে। আরও দেখবে, কোন এক গাঁয়ের মেয়ে হয়ত কাঁথা সেলাই করছে কিম্বা রঙ-

বেরঙের সুতো নিয়ে সিকা বুনছে। তার উনুনের উপর তরকারি পুড়ে যাচ্ছে, কিম্বা কোলের ছেলেটি মাটিতে পড়ে আছাড়িপিছাড়ি কান্না কাঁদছে। কোন দিকে তার খেয়াল নেই। সে সুতোর পর সুতো লাগিয়ে কাঁথার উপর নতুন নক্সা বুনট করছে। সেই রাখাল ছেলে সেই গ্রামের মেয়ে এরাই হবে তোমার সত্যিকার শিল্পীবন্ধু। এদের সঙ্গে যদি মিতালি করতে পার তবে তোমার গ্রাম্য জীবন একঘেয়ে হবে না। চাই কি, তাদের সৃজন-প্রণালী যদি তোমার ছবিতে প্রভাব বিস্তার করে, তুমি শিক্ষিত সমাজের শিল্পে নতুন কিছু দান করতে পারবে।"

খেলনা-পুতুলের বিষয়ে তিনি বলিতেন, "কৃষ্ণনগরের খেলনা পুতুল রিয়ালিটিক। এক অংশ ভেঙে গেলে সেগুলো দিয়ে আর খেলা করা যায় না। আমাদের গ্রামদেশী পুতুল আইডিয়ালিটিক, এক অংশ ভেঙে গেলেও তা দিয়ে খেলা করা যায়। এমনি বহু সুন্দর সুন্দর কথা শুনিতাম নন্দলালের কাছে। আজ নন্দলাল অসুস্থ হইয়া শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিতেছেন। কোন ছাত্র যদি তার সঙ্গে তার শিল্পী-জীবনের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করেন, তবে উহা সমস্ত বাঙালীর সম্পদ হবে। নন্দলাল আমার 'বালুচর' পুস্তকের জন্য একখান। সুন্দর প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছিলেন। 'রাখালী'র বর্তমান সংস্করণ নন্দলালের আঁকা একটি প্রচ্ছদপটে শোভা পাইতেছে।

সেবার নন্দলালের সঙ্গে শান্তিনিকেতন গেলাম। যে কয়দিন ছিলাম শিল্পীর পত্নী অতি যত্নের সঙ্গে আমার আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। পানিবাসে আমার থাকার ব্যবস্থা হইল। পান্থনিবাসের ঘরের ছাতের উপর নন্দলাল কতকগুলি মাছের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। সেগুলির দিকে চাহিয়া পথিকের মনে জলের

শীতলতা আনিয়া দেয়। নন্দলাল গর্বের সঙ্গে বলিতেন, সাঁওতালের পথ দিয়া যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে তাঁহার আঁকা ছবিগুলির দিকে চাহিয়া দেখে। এই ব্যাপারটি তার শিল্পী-জীবনের একটি বড় সার্থকতা বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

পান্থনিবাসে আসিয়া দেখা হইল পাগলা নিশিকান্তের সঙ্গে। নিশিকান্ত ছবি আঁকে। সে ছবির সঙ্গে অন্য কারো ছবির মিল নাই। নিশিকান্ত কবিতা লেখে, সে কবিতার সঙ্গে কারো কবিতার মিল নাই। এমন অদ্ভুত ভাব-পাগল। অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীতে আগেই তাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। এবার সে পরিচয় আরও নিবিড় হইল। নিশিকান্তের বন্ধু সান্ত্বনা গুহ। সুতরাং সে আমারও বন্ধু হইল। অনেক রাত পর্যন্ত তিন বন্ধুতে গল্পগুজব করিলাম। শেষরাত্রে শান্তিনিকেতনের বৈতালিকদল, 'আমার বসন্ত যে এলো' গানটি গাহিয়া সমস্ত আশ্রম পরিক্রমা করিতেছিল। সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। যেন এক স্বপ্ন-জগতে জাগিয়া উঠিলাম। তখন ভোরের আলোকে চারিদিক পরিষ্কার হয় নাই। আলো-আঁধারী ভোরের বাতাসে পাখির সঙ্গে বৈতালিকদের গান আম্র শুরুর শাখায় শাখায় আনন্দের শিহরণ তুলিতেছিল। বসন্ত যে আসিয়াছে তাহা এখানে আসিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

সকালে নিশিকান্ত, সান্ত্বনা আর তাদেরই মত যত পাগলাটে ছেলেদের আশ্রয়স্থল শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আসিয়া হাজির হইলাম। সেখানে প্রভাত কুমারের স্ত্রী সুধা-দিদি হাসিমুখে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁর ছোট ঘোট দুই ছেলে, সুপ্রিয় দেবপ্রিয় আব প্রভাত কুমারের ভাইঝি হাসু আসিয়া আমাদের সমনে দাঁড়াইল। সুতরাং আমাকে আর পায় কে! গল্পের উপরে গল্প চলিল। কবিতার উপরে কবিতা আবৃত্তি হইতে লাগিল। আমি আর নিশিকান্ত, নিশিকান্ত আর আমি

দুইজনে পালা করিয়া মনের সাধ মিটাইয়া গল্প বলিয়া চলিলাম। পাশের ঘরে বইপুস্তক লইয়া প্রভাতদা মশগুল হইয়াছিলেন। আমাদেয় এই হৈ-হুল্লোড় যখন চরমে উঠিতেছিল তিনি মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিলেন।

সুধা-দি আমাকে বিকালে চায়ের নিমন্ত্রণ করিলেন। সকালে আমরা গল্প বলিয়া, কবিতা আবৃত্তি করিয়া ছোটদের আকর্ষণ করিয়াছি। এইবার তাদের পালা। হাসু, হাসুর বন্ধু মমতা, হাসুর দিদি অনু আরও ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া এমন সুন্দর নাচ দেখাইল! সুধাদি তাঁর এস্রাজ বাজাইয়া সেই নাচের আবহসংগীত পরিবেশন করিলেন। মনে হইল এইসব ছেলেমেয়েরা যেন কতকাল আমার পরিচিত। তখনও আমার ছেলেমেয়ে হয় নাই। মনের বাৎসল্যসুধা তাই পরের ছেলেমেয়ে দেখিলে উৎসারিত হইয়া উঠিত।

প্রভাতদার ভাইঝি হাসুর বয়স তখম পাঁচ-ছয় বছর। তার মুখখানা এমন করুণ মমতা মাখানো! কাছে ডাকিয়া আদর করিলে আদর করিতে দেয়। আমার হৃদয়ের সুপ্ত বাৎসল্য-স্নেহ এই ছোট্ট মেয়েটিকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া উঠিল। হাসুকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, "তোমার সঙ্গে আমার খুব ভাব। না দিদি?" ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া হাসু চাহিয়া রহিল। বিদায়ের দিন তাকে ডাকিয়া বলিলাম, "হাসু! কলকাতা গিয়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখবো। তুমি উত্তর দেবে তো? হা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এই ভাবে সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া শান্তিনিকেতনের ছেলেদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করিয়া সন্ধ্যার আগে প্রভাতদার বাসায় আসিলাম। বার-তের বছরের ছোট একটি মেয়ে প্রভাতদার বাড়িতে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিল। তার কবিতার খাতাটি আমাকে

দেখাইল। ছন্দের হাতটি তখনো পাকা হয় নাই। আমি তাহাকে খুব উৎসাহ দিলাম। সুধাদি বলিলেন, 'মেয়েটি ভাল গান করে, ওর গান শুনবে?'

মেয়েটি অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া অতুলপ্রসাদের রচিত একটি গান গাহিল। "ওগো, সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব তব সাথে।' সে কি গান, না দূর-দূরান্তর হইতে ভাসিয়া-আসা কোন নাম-না-জানা পাখীর কণ্ঠস্বর! গান শেষ-করিয়া মেয়েটি সুন্দর হাত দুইটি তুলিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাতলা একহারা চেহারা, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। নতুন ধানের পাতার সমস্ত বর্ণসুষমা কে যেন তাহার সমস্ত গায়ে মাখাইয়া দিয়াছে। মনে হইল, এমন গান কোনদিন শুনি নাই। এমন রূপও বুঝি আর কোথাও দেখি নাই। আজও তার গানের রেশ আমার কানে লাগিয়া আছে। আমার সোজন বাদিয়ার ঘাট' পুস্তকে নায়িকার রূপ বর্ণনা করিতে আমি এই মেয়েটিকে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলাম। পুস্তকের দুইটি অংশ প্রত্যেক অংশের আগে অতুলপ্রসাদের এই গানটি আমি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। মেয়েটি আজ কোথায় আছে জানি না। হয়ত কোন সুন্দর স্বামীর ঘরণী হইয়া ছেলেমেয়ে লইয়া সুখে আছে। সে কোনদিনই জানিতে পারিবে না

যে তার সেই ক্ষণিকের দর্শন আর সুমধুর গান আমাকে সুদীর্ঘ সোজন বাদিয়ার ঘাটের কাহিনী লিখিতে সাহায্য করিয়াছিল। আমার এই পুস্তক সে হয়ত অপর দশজনের মতই বাজার হইতে কিনিয়া পড়িয়াছে, অথবা পড়ে নাই। নিজে তাহাকে এই বই উপহার দিয়া তাহার মতামত জানিবার সুযোগ কোনদিনই হইবে না। লেখকজীবনে এমনি বেদনার ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

চার-পাঁচ দিন শান্তিনিকেতনে থাকিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। বিদায়ের দিন হাসুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হাসু, তোমাকে আমি চিঠি লিখব—কবিতা করে ছড়া কেটে চিঠিতে চিঠিতে তোমার সঙ্গে কথা বলব। তুমি উত্তর দেবে তো? ঘাড় নাড়িয়া হাসু জানাইল, সে উত্তর দিবে।

এর আগে আমি ছোটদের জন্য কবিতা লিখি নাই। কলিকাতা আসিয়া হাসুকে খুসি করিবার জন্য ছোটদের উপযোগী কবিতা লেখায় হাত দিলাম। আমার যেন দিনরাত্রের তপস্যা হইল, ওই একরত্তি ছোট্ট মেয়েটিকে খুসি করা। ছড়া কাটিয়া নানা ছন্দে ভরিয়া হাসুকে পত্র লিখিতে লাগিলাম। ছোট্ট মেয়ে। তার সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলায় সময় কাটায়। আমার এই অসংখ্য পত্রের উত্তর দেওয়ার সময় কোথায়? তবু মাঝে মাঝে আকাবাঁকা হাতের ছোট্ট এক একখানা চিঠি সে আমাকে পাঠাইত। সেই সব পত্র পাইয়া আমি যেন সাত রাজার ধন হাতে পাইতাম। চিঠি অবলম্বন করিয়া মনে মনে কল্পনার রথকে উধাও ছুটাইতাম। ইহাতেও মনের আশা মিটিত না। অবসর পাইলেই শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইতাম। যাইবার আগে কোন্ কোন্ গল্প বলিয়া হাসু আর তার বন্ধুদের খুসি করিব, বারবার মনে আওড়াইয়া লইতাম। সেখানে গিয়া সুধাদির বাড়িতে পূর্বের মতই আমার গল্পের আসর বসিত। মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে ছোটদের জন্য লেখা বই কিনিয়া হাসুকে পাঠাইতাম। উপহার-পৃষ্ঠায় গবাদাকে দিয়া অথবা প্রশান্তকে দিয়া রঙ-বেরঙের ছবি আঁকাইয়া লইতাম।

একবার হাসু গড়াইতে আসিয়াছিল যাদবপুরে তাদের আত্মীয় ডাঃ হীরালাল রায়ের বাড়িতে। সেখানে গিয়া হাসুর সঙ্গে দেখা করিলাম। শ্রীমতি রায় আদর করিয়া আমাকে

গ্রহণ করিলেন। তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হারই মত আমার আপন হইয়া উঠিল। তাদের সঙ্গে নিয়া গল্প গুজব করিয়া সারাদিন কাটাইয়া আসিলাম।

এইভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর ঘুরিয়া চলিল। ছয় মাস পরে, এক বছর পরে, সুযোগ পাইলেই আমি শান্তিনিকেতনে আসি। হাসুর সঙ্গে দেখা হয়।

সেবার সিভিল-ডিস্‌ওবিডিয়েন্স আন্দোলনে ইস্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়া গেল। আমি মাসখানেকের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হাসু বড় হইয়াছে। ডাকিলে কাছে আসিতে চায় না। সে যে বড় হইয়াছে, একথা আমি যেন ভাবিতেই পারি না। রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা'র মত আজ আমার মনের অবস্থা। বুঝিলাম বীণা-যন্ত্রের কোন অজ্ঞাত 'তার যেন ছিড়িয়া গিয়াছে। সুধাদি কত ডাকিলেন হাসুর মা সুন্দরদি কত ডাকিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর হাসু আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। সেই মমতা-মাখানো মুখখানি তেমনি আছে। আজ আদর করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিতে পারি না। ছড়ার ঝুমঝুমি বাজাইয়া তাহাকে খুশি করিতে পারি না। হাসুর বন্ধুরা সকলেই আসিল। মমতা আসিল-অনু, মিনু আসিল, কিন্তু গল্পের আসর যেন তেমন করিয়া জমিল না। নিজের আস্তানায় আসিয়া কোন্ সাত সাগরের কান্নায় চোখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কেন ও বড় হইল? কেন ও আগের মত ছোটটি হইয়া রহিল না? এমনি প্রশ্নমালায় সমস্ত অন্তর মথিত হইতে লাগিল। এই মেয়েটি যদি আসিল—আমার বোনটি হইয়া আসিল না কেন! আমার কোলের মেয়েটি হইয়া আসিল না কেন! যে কার অভিশাপে চিরজন্মের মত পর হইয়া গেল।

কলিকাতা আসিয়া পলাতক’ নামে একটি কবিতা লিখিলাম। হাসু নামে ছোট্ট একটি খুকু আজ যে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে! খেলাঘরের খেলনাগুলি তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে সে আর খেলা করিতে আসিবে না। সে যে পলাইয়া গিয়াছে তা তার বাপ জানে না, মা জানে না, তার খেলার সাথীরা জানে না, সে নিজেও জানে না। কোন সুদূর তেপান্তরের বয়স তাহাকে আজ কোথায় লইয়া গিয়াছে। কোনদিনই সে আর খেলাঘরে ফিরিয়া আসিবে না। কবিতাটি শেষ করিয়াছিলাম একটি গ্রাম্য ছড়া দিয়া—

এখানটিতে খেলেছিলাম ভাঁড়-কাটি সঙ্গে নিয়ে
এখানটি রুধে দে ভাই ময়নাকাঁটা পুতে দিয়ে।

কবিতাটি ‘আহেরিয়া’ নামে একটি বার্ষিক কাগজে ছাপা হইলে হাসুকে একখানি বই পাঠাইয়াছিলাম। হাসু একটি সংক্ষিপ্ত পত্রে উত্তর দিয়াছিল—‘জুসীদা, তোমার কথা আমি ভুলি নাই। আমার শিশুকালে তুমি গল্প-কবিতা শুনিয়েছ, ছোট বয়সের স্মৃতির সঙ্গে তোমার কথাও আমি কোনদিন ভুলব না।

হাসুকে লেখা কবিতাগুলি দিয়া আমার হাসু পুস্তকখানি সাজাইলাম। ভাবিয়াছিলাম, এই পুস্তক রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করিব। কারণ তাঁহারই আশ্রমকা হাসুর উপরে কবিতাগুলি লিখিয়াছি। পরে ভাবিয়া দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথকে তে কত লেখকই বই উৎসর্গ করে। এ বই পড়িয়া সব চাইতে খুশি হইবেন আমার জননীসম সুধাদি আর হাসুর মা সুন্দরদি। বইখানি ইহাদের নামে উৎসর্গ করিলাম। সুধাদির কথা ভাবিলে আজও আমার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে। এই সর্বংসহা দেবীপ্রতিমা কত

আধপাগলা, ক্ষ্যাপা, স্নেহপিপাসু ভাইদের ডাকিয়া আনিয়া তাঁর গৃহের স্নেহ-ছায়াতলে যে আশ্রয় দিয়াছেন,তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমি হাসুকে বেশী আদর করিতাম। তার জন্য কলিকাতা হইতে বই-পুস্তক পাঠাইত; সুধাদির ছোট ছোট ছেলেদের জন্য কিছুই পাঠাইতাম না। ছেলেরা কিন্তু হিংসা করিত না, সুধাদিও বিরক্ত হইতেন না। সুধাদি ছাড়া যে কোন ছেলের মা এমন অবস্থায় আমার জন্য গৃহ দ্বার বন্ধ করিতেন। সুধাদি—আমার এমন সুধাদির কথা বলিয়া ফুরাইতে চাহে না। কতদিন সঁহাদের সহিত জানাশুনা নাই। সুধাদি এখন কেমন আছেন জানি না। কিন্তু আমার মনের জগতে সুধাদি প্রভাতদা তাঁদের দুই ছেলে সুপ্রিয় দেবপ্রিয়, আর হালু হাত ধরাধরি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

প্রভাতদার মত অত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি সামান্য বেতনে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে গ্রন্থাগারিকের কাজ করিতেন। সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তাই সুধাদিকেও শিক্ষকতার কাজ করিতে হইত। ঘরসংসারের কাজকরিয়া ছেলেদের দেখাশুনা করিয়া শিক্ষকতার কাজ করিয়া তার উপরেও দিদি হাসিমুখে আমাদের মত ভাইদের নানা স্নেহের আবদার সহ করিতেন। ডাকিয়া এটা-ওটা খাওয়াইতেন। তাঁর হাসিমুখের 'ভাই' ডাকটি শুনিয়া পরাণ ভরিয়া যাইত। প্রভাতদা অন্যত্র এখানকার বহুগুণ বেতনে চাকুরীর 'অফার পাইয়াছিলেন, কিন্তু কবিগুরুর আদর্শকে রূপায়িত করিতে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া তিনি অন্যত্র যান নাই।

শান্তিনিকেতনে আরও কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের রূপায়ণে তিলে তিলে নিজদের দান করিয়া গিয়াছেন। একজন জগদানন্দ রায়—গ্রহ-নক্ষত্রের কথা,

বিজ্ঞানের কথা এমন সুন্দর করিয়া সহজ করিয়া লিখিবার লোক আজও বাঙালীর মধ্যে হইল না। তার বইগুলি বাজারে দুষ্প্রাপ্য। বাঙালীর ছেলেমেয়ে দের এর চাইতে দুর্ভাগ্যের আর কিছু নাই। চেহারায় ব্যবহারে একেবারে কাঠখোটা মানুষটি, কিন্তু দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে তিনি জলের মত সহজ করিয়া লিখিতে পারিতেন। আরও একজনের নাম করিব—স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন। এমন মধুর কথকতা করিতে বুঝি আর কোথাও কাহাকে পাওয়া যাইবে না। তার গবেষণা বিষয়ে আমার মতানৈক্য আছে, কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কথায় বার্তায় যেন শ্বেতচন্দন মাখানো ছিল। তাঁর সঙ্গে ক্ষণিক আলাপ করিলেও সেই চন্দনের সুবাস সারাজীবন লাগিয়া থাকিত।

একবার রংপুরে গিয়াছি গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করিতে। শুনিলাম ক্ষিতিমোহন আসিয়াছেন সেখানে বক্তৃতা করিতে। গিয়া দেখা করিলাম। তিনি সস্নেহে আমাকে গ্রহণ করিলেন। গ্রাম্য-গান সংগ্রহের বিষয়ে তাঁর কাছে উপদেশ চাহিলাম। তিনি সাধক রজবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তার ব্যাখ্যা করিলেন। সাধনের কথা সেই যেন জিজ্ঞাসা করে যে নিজের হাতে নিজের ছের কেটে এসেছে। তোমার আত্মীয়স্বজন বলবে, এইভাবে তুমি কাজ কর যাতে তোমার খ্যাতি হয়। অর্থাগম হয়। তোমার দেশবাসী বলবেন, এইভাবে কাজ কর—আমরা তোমাকে যশে উচ্চ শিখরে নিয়ে যাব। তোমার লৌকিক ধর্ম বলবে, এইভাবে কাজ কর—তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাব। তোমার দৈহিক অভাব-অভিযোগ বলবে, এইভাবে কাজ করলে তোমার অর্থাগম হবে—কোন দুঃখ-দরিদ্র থাকবে না। এই সমস্তকে অতিক্রম করে তুমি তোমার আত্মার যে ধর্ম তারই পথ অনুসরণ করে চলবে। মনে মনে ভাববে, কি তোমার করণীয় কি করতে তুমি এসেছ। রাজভয়, লোকভয়, আত্মপরিতৃপ্তি কিছুই যেন তোমাকে তোমার পথ হতে বিভ্রান্ত করতে পারে না। ছের কেটে দিয়ে তবে তোমার সাধনের পথে অগ্রসর হতে হবে।

ক্ষিতিমোহনের এই উপদেশ আজও আমার অন্তরে ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শান্তিনিকেতনে থাকিয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া সময় কাটাই। পরিচয় হইল শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে। তখন তার কৈশোরকাল। এমন মধুর কণ্ঠ! তাকে ডাকিয়া লইয়া খোয়াই নদীর ধারে বসি। আকাশের শূন্য পথে দু-একটি পাখী উড়িয়া যায়। নদীর ওপারে সাঁওতালমের গ্রামে দিনের আলো ম্লান হইয়া আসে। শান্তি গানের পর গান গাহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গান কলিকাতায় বহু লোকে মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু শান্তির কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীতের যে ঢংটি ফুটিয় ওঠে, এমন আর কোথাও পাই না। সে গানের সুরকে কণ্ঠের ভিত লইয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কেমন যেন পেলব করিয়া দেয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুরের বুনোট-কার্য শূন্য বাতাসের উপর মেলিয়া ধরিয়া শান্তি গান গাহিয়া চলে। গানের কথা-সুরের অপূর্ব কারুকারিতা যেন রামধনুকের রেখা লইয়া মনের উপর রঙের দাগ কাটতে থাকে মনে হয়, জীবনে যা-কিছু পাই নাই—যার জন্য দুঃখের আর জ্বালাইয়া সুদীর্ঘ বেঘুম রজনী জাগিয়া কাটাইয়াছি, সেই বেদনা কাহিনী বুঝি সুরের উপর মেলিয়া, ধরিয়া ক্ষণিকের তৃপ্তিলাভ বলা যায়। দুই চোখ বহিয়া ধারার পর ধারা বহিতে থাকে। শান্তি অবাক হইয়া গান বন্ধ করে। আবার তাহাকে সাধ্যসাধন করিয়া গান গাওয়াই। বহুকাল পরে এবার বোম্বাই রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে শান্তি আসিয়াছিল গান গাহিতে। কণ্ঠস্বরটি তার আগের মতই সুন্দর আছে। দুই বন্ধুতে মিলিয়া একদিন প্রায় সারারাত্রি নানা রকমের গানের সুর-বিস্তারের উপর আলোচনা করিলাম। শুধু কি তাই—মাঝে মাঝে আমাদের বিগত জীবনের সেই খোয়াই নদী তীরের কাহিনী কি আসিয়া মনকে দোলা দিল না?

সেবার শান্তিনিকেতনে আরও দুইটি মেয়ের গান শুনিলাম। খুকু আর নুটুদির গান। মলিন চেহারার মেয়ে খুকু। গান গাহিতে বলিলেই গান গাহে, সাধ্যসাধনা করিতে হয় না। ওর হৃদয়ে যেন কোন ক্রন্দন লুকাইয়া ছিল। গান গাহিতে বলিলেই সেই ক্রন শ্রোতার মনে ঢালিয়া দিয়া সে হয়ত তৃপ্তি পাইত। খুকু আর ইহজগতে নাই। অতি অল্প বয়সে সে তার শ্রোতাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া হয়ত কোন দেবসভায় মরধামের গান বিতরণ করিতেছে।

নুটুদির গান শুনিলাম বর্ষামঙ্গলের মহড়ায়। গানের মহড়ায় বাইরের লোক যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু দিনুদাকে (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলিতেই তিনি সহাস্যে অনুমতি দিলেন। নুটুদির মুখে যাহারা রবীন্দ্রসংগীত না শুনিয়াছেন, তাহাদের দুর্ভাগ্য। গানের কোন কোন স্থানে সুরকে তিনি এমন সরু করিয়া লইতেন যেন তা বোঝা যায় কি যায় না। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় কখনো দিলে পরায়ে গোপনে ব্যথার মালা—বিরহ মালা' গানটি তিনি বড় সুন্দর করিয়া গাহিয়াছিলেন, তেমন আর কোথাও শুনি নাই। নুটুদির বিবাহ হইল বন্ধুবর সুরেন করের সঙ্গে। তাঁর আঁকা 'সাথী' ছবিটি জগৎ-বিখ্যাত। সেই ছবি তিনি হাসিমুখে আমার রাখালী' পুস্তকের কভারে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। শুনিলাম সন্তান-সম্ভাবনার সময় নুটুদি মারা গিয়াছেন। সে কালের রবীন্দ্রসংগীত গাহিবার জন্য বোধ হয় এক শান্তিদেব ঘোষই আছে। একদিন রবীন্দ্রনাথ দিনুদাকে বলিতেছেন, শুনিয়াছিলাম, শান্তির উপর একটু বেশি নজর দিস। আমাদের পরে ওই ত আমার গানের ভাণ্ডারী হবে।

এইভাবে গান শুনি–নিশিকান্ত আর সান্ত্বনার সঙ্গে আড্ডা জমাই সেই বয়সটায় কথার অভাব হয় না। ঘরের কথা, পরের কথা, হাটের কথা, ঘাটের কথা—সমস্ত কথা মিলাইয়া

কথার সরিৎসাগর জমাই। শান্তিনিকেতনের শিক্ষকেরা দেখা হইলে হাতজোড় করিয়া অভিবাদন জানান, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সবাই আমার উপর তুষ্ট। কোথাও কোন আবিলত নাই। নিশিকান্ত বলে, 'জসীম তুমি এখানে একটা মাস্টারি নিয়ে থেকে যাও। আমিও কতকটা নিমরাজি হই। ইস্কুল-কলেজ বন্ধ। কবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবে কে জানে। মন্দ কি! কিছুদিন মাস্টারি করিলে ক্ষতি কি। দুই বন্ধু আমার জন্য দরবার করে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পরে কবি কিছুদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবস্থান করেন। এই সময় আমি প্রায়ই কবির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। একদিন কবিকে গিয়া বলিলাম, "আমরা আপনাকে মনে মনে কি ভাবে কল্পনা করি তা হয়ত আপনার জানতে ইচ্ছা করে। আপনার উপর নতুন ছন্দে একটি কবিতা লিখেছি। যদি বলেন তো পড়ে শুনাই।"

কবি বলিলেন, 'কবিতাটি আমাকে দাও। আমি নিজেই পড়ি।'

আমি বলিলাম, আমার হাতের লেখা আপনি পড়তে পারবেন না।

কবি বলিলেন, "তুমি দাও, আমি ঠিক পড়ব।"

কম্পিত হস্তে তাঁকে কবিতাটি দিলাম। কবি মনে মনে কবিতাটি পড়িতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, পড়ায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ হইবে না মনে করিয়াই তিনি আমাকে পড়িতে দিলেন না। কারণ, তিনি এতটুকু উচ্চারণ-দোষ সহ্য করিতে পারিতেন না। কবির

নিজের নাটকে যাহার পাঠ লইতেন, কবির নিকট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উচ্চারণ শিখিতে তাহাদের প্রাণান্ত হইত। কবিতাটি পড়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন, 'বেশ হয়েছে।'

আমি বলিলাম, 'কবিতাটিতে ত্রিপদী ছন্দ একটু নতুন ধ্বনিতে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছি।'

তিনি লেখাটিতে কিছুক্ষণ চোখ বুলাইয়া উত্তর করিলেন, 'তা এটিকে নতুন ছন্দ তুমি বলতে পার।'

রবীন্দ্রনাথ আমাকে দেখিলেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই যে ঘরে আগুন লাগে, তার কারণ সেই ঘরের মধ্যে বহুকাল আগুন সঞ্চিত ছিল। যাঁরা বলতে চান, আমরা সবাই মিলমিশ হয়ে ছিলুম ভাল, ইংরেজ এসেই আমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিল–তাঁরা সমস্যাটিকে এড়িয়ে যেতে চান।

একদিন বন্দেমাতরম্ গানটি লইয়া কবির সঙ্গে আলোচনা হইল। কবি বলিলেন, বন্দেমাতরম্ গানটি যে ভাবে আছে, তোমরা মুসলমানেরা তার জন্য আপত্তি করতে পার। এ গানে তোমাদের ধর্ম্মমত ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ আছে।

এর পরে 'বন্দেমাতরম্ গান লইয়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে খুব বিবোধ চলিতেছিল। কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে 'বন্দেমাতরম্' গান লইয়া মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এক

প্রতিবাদসভা বসে। সেই সভার কথা শুনিয়া শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার সাম্প্রদায়িক মিলনের উপর এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। মুসলমান ছাত্রেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা শোনে এবং তাহাদের প্রতিবাদের বিষয়টিও তাহাকে বুঝাইয়া বলে। সেই সভায় আমি খুব অভিমানের সঙ্গেই বলিয়াছিলাম, আজ 'বন্দেমাতরম গান নিয়ে আমাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাণ্ড বিরোধের উপক্রম হয়েছে। কখন যে এই বিরোধ অগ্নি-দাহনে জ্বলে ওঠে, কেউ বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই গান নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কবি এ কথা স্বীকার করেছিলেন, বন্দেমাতরম্ গানে আপত্তি করবার মুসলমানদের কারণ আছে। কিন্তু আজ জাতি যখন এই ব্যাপার নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তখন কবি কেন নীরব আছেন? তিনি কেন তার মতামত ব্যক্ত করছেন না?

আমার বক্তৃতার এই অংশটি কোন পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া উহার সম্পাদক আমাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রমাণ করিতে ও রবীন্দ্রনাথের বিরাগ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহার অল্প দিন পরে কলিকাতায় সর্বভারতীয় জাতীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসে; তখন 'বন্দেমাতরম্' গান লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়। সেই সময়ে একদিন বন্ধুবর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলিলাম, রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন, বন্দেমাতরম গানে মুসলমানদের আপত্তির কারণ আছে। আজ সারা দেশ এই গান নিয়ে বিরাট সাম্প্রদায়িক কলহের সম্মুখীন হচ্ছে। এখন তো কবি একটি কথাও বলছেন না।

সৌম্যেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জহরলাল নেহেরু গানটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবির পরামর্শের ফলে এ গানে তোমাদের আপত্তিজনক অংশটি কংগ্রেসের কোন অনুষ্ঠানে আর গীত হবে না"।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পর কবি কিছুদিন অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই অসুস্থ অবস্থার মধ্যে কবি শিল্পীদলের অভিদন্দন গ্রহণ করেন। অভিনন্দন-সভা ঠাকুরবাড়ির হলঘরে বসিয়াছিল। 'নন্দলাল প্রমুখ। শিল্পীরা প্রত্যেকে কবিকে এক একখানা করিয়া চিত্র উপহার দিয়াছিলেন। উহার পর কিছুদিনের জন্য কবি আর কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। এই সময়ে আমি প্রায়ই কবির সঙ্গে দেখ করিতে যাইতাম। আমাকে দেখিলেই কবি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেন। বলিতেন কেন যে মানুষ একের অপরাধের জন্যে অপরকে মারে! ও-দেশের মুসলমানেরা হিন্দুদের মারল, তাই এদেশের হিন্দুরা এখানকার নিরীহ মুসলমানদের মেরে প্রতিবাদ জানাবে এই বর্বর মনোবৃত্তির হাত থেকে দেশ কি ভাবে উদ্ধার পাবে বলতে পার? কী সামান্য ব্যাপার নিয়ে মারামারি হয়—গরু-কোরবানী নিয়ে, মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। একটা পশুকে রক্ষা করতে মানুষ মানুষকে হত্যা করেছে।"

এই সব আলোচনা করিতে কবি মাঝে মাঝে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। একদিন আমি কবির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, এখন বাবার শরীর অসুস্থ। আপনাকে দেখলেই তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে তাতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীরে এই উত্তেজনা খুবই ক্ষতিকর। আপনি কিছুদিন বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না।

তখনকার মত আমি কবির সঙ্গে দেখা করিলাম না।

মুসলমানদের প্রতি কবির মনে কিছু ভুল ধারণা ছিল। তিনি সাধারণত হিন্দু পত্রিকাগুলিই পড়িতেন। মুসলমানি পত্রিকার একআধ টুকরা মাঝে মাঝে কবির হাতে পড়িত।

কবির ভুল ধারণার প্রতিবাদ করিয়া উপযুক্ত কারণ দেখাইলেই কবি তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া লইতেন। কবির মনে একদেশদর্শী হিন্দুত্বের স্থান ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীন মতবাদ লইয়া ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা করিতেন, তাহাদের প্রতি কবির মনে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু কবির নিকটে যাঁহারা আসিতেন, কবি শুধু তাহাদিগকেই জানিতেন। এই বয়সে ইহার বেশি খবরাখবর লওয়া কবির পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

একদিন কবি বলিতে লাগিলেন, দেখ, জমিদারির তদারক করতে সাজাদপুরে যেতাম। আমাদের একজন বুড়ো প্রজা ছিল। যৌবনকালে সে অনেক ডাকাতি করেছে। বুড়ো বয়সে সে আর ডাকাতি করতে যেত না। কিন্তু ডাকাতরা তাকে বড়ই মানত। একবার আমাদের এক প্রজা অন্য দেশে নৌকা করে ব্যবসা করতে যায়। ডাকাতের দল এসে নৌকা ঘিরে ধরল। তখন সে আমাদের জমিদারির সেই বুড়ো প্রজার নাম করল। তারা নৌকা ছেড়ে চলে গেল। এই বলে চলে গেল, ও তোমরা অমুক দেশের অমুকের গাঁয়ের লোক—যাও, তোমাদের কোন ভয় নেই। সেই বৃদ্ধ মুসলমান আমাকে বড়ই ভালবাসত। তখন নতুন বয়স। আমি জমিদারির তদারক করতে এসেছি। বুড়ো প্রায় পাঁচশ প্রজা কাছারির সামনে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, এত লোক ডেকে এনেছ কেন?

সে উত্তর করল, ওরা আপনাকে দেখতে এসেছে। ওরে তোরা দেখ। একবার প্রাণভরে সোনার চাঁদ দেখে নে। আমি দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলাম।

কবি বাংলা কবিতার একটি সংকলন বাহির করিবেন। আমাকে বলিলেন, তোমার সংগ্রহ থেকে কিছু গ্রাম্য গান আমাকে দিও। আমার বইয়ে ছাপাব।

আমি কতকগুলি গ্রাম্য গান কবিকে দিয়ে আসিলাম। তাহার চার-পাঁচ দিন পর প্রশান্ত মহলানবীশের গৃহে কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মহলানবীশ তখন কবির কাছে ছিলেন। কবি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “ওহে, তোমার সংগ্রহকরা গানগুলি পড়লাম। আমাদের দেশের রসপিপাসুরা ওগুলোর আদর করবে। কিন্তু আমি বইটি সংকলন করছি বিদেশী সাহিত্যিকদের জন্যে। অনুবাদে এগুলির কিছুই থাকবে না। ময়মনসিংহগীতিকা থেকে কিছু নিলাম, আর ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ থেকেও কিছু নেওয়া গেল?

আমি বলিলাম, ‘ময়মনসিংহ-গীতিকার’ গানগুলি শুধুমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহে সাত আট বৎসর গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি, কোথাও এই ধরনের মাজাঘষা সংস্করণের গীতিকা পাওয়া যায় না। গ্রাম-গাঁথার একটা কাঠামো সংগ্রহ করে চন্দ্রকুমার দে তার উপর নানা রচনা-কার্যের বুনট পরিয়ে দীনেশবাবুকে দিয়েছেন। তাই পল্লীর অশিক্ষিত কবিদের নামে চলে যাচ্ছে।

কবি বলিলেন, কিন্তু ময়মনসিংহ-গীতিকায় কোন কোন জায়গায় এমন সব অংশ আছে যা চন্দ্রকুমার দে’র রচিত বলে মনে হয় না।

আমি উত্তর করিলাম, এ কথা সত্য। এই অংশগুলি প্রচলিত ছোট ঘোট গ্রাম্য গান। চন্দ্রকুমারবাবু এগুলি সংগ্রহ করে সেই প্রচলিত পল্লীগীতিকার কাঠামোর মধ্যে ভরে দিয়েছেন। ময়মনসিংহগীতিকার সেই অংশগুলিই দেশ-বিদেশের সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা ছাড়া পল্লীগীতিকার কাহিনীর যে কাঠামোর উপরে এই ধরনের বুনট-কার্য হয়েছে, সেই গল্পাংশেরও একটা মূল্য আছে।

কবি বলিলেন, আমাদের ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহগুলি তো চমৎকার।

আমি উত্তর করিলাম, ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগ্রহগুলি আমি দেখি নাই। প্রবাসীতে ‘বাউল’ নামক প্রবন্ধে চারুবাবু কতকগুলি গ্রাম্য গান প্রকাশ করেছেন। সেগুলি নাকি ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগ্রহ হতে নেওয়া। তার থেকে কয়েকটি লাইন আপনাকে শুনাই—

কমল মেলে কি আঁখি, তার সঙ্গে না দেখি
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে,
আমি মেলুম্ না, মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তার প্রথম চাওনে।

আপনি কি বলবেন, এসব লাইন কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য বাউলের রচিত হতে পারে। আপনার কবিতার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, এমন লাইন তারা রচনা করতে পারে? ক্ষিতিমোহনবাবুর আরও একটি গানের পদ শুনুন–

ও আমার নিঠুর গরজী,
তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে।

এই মানস-মুকুল কথাটি কি কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক জানে? এই গানটি কি আপনার ‘তোর কেউ পারবি না রে পারবি না ফুল ফোটাতে’ মনে করিয়ে দেয় না?

কবি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর উত্তর করিলেন, তাইত ভাবি, এঁরা যদি আগেই এরূপ লিখে গেলেন, তবে আমাদের পরে আসার কি সার্থকতা থাকল?

আমি কবিকে বলিলাম, আপনি কি কোন প্রবন্ধে এইসব তথাকথিত গ্রাম-গানগুলির বিষয়ে আপনার অভিমত লিখবেন? আপনি যদি লেখেন, তবে দেশের বড় উপকার হবে। যারা খাঁটি গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করেন, তাদের সংগ্রহের আদর হবে।

কবি উত্তর করিলেন, “দেখ, ক্ষিতিমোহন আমার ওখানে আছে, তার সংগ্রহ-বিষয়ে আমি কিছু বিরুদ্ধ মত দিয়ে তার মনে আঘাত দিতে চাই নে।”

প্রশান্তবাবু আমাকে বলিলেন, আপনি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন না কেন? আমি বলিলাম, দীনেশবাবু আমার জীবনের সব চাইতে উপকারী বন্ধু। কত ভাবে যে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নাই। আমি যদি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি, তিনি বড়ই ব্যথা পাবেন। পূর্বের কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি কবিকে বলিলাম, আপনার সংকলন-পুস্তকে যদি এই সব গান গ্রাম্য-সাহিত্যের নামে চলে যায়, তবে এর পরে যারা খাঁটি গ্রাম-গান সংগ্রহ করবেন, তাদের বড়ই বেগ পেতে হবে। কারণ এই সব সংগ্রহের সঙ্গে প্রচলিত আধুনিক সাহিত্যের মিশ্রণ আছে বলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। তারা এগুলি পড়ে বলে, দেখ দেখ, অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিরা কেমন আধুনিক কবিদের মত

লিখেছে। যারা বহু পরিশ্রম করে খাঁটি গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করেন, তাদের সংগ্রহ পড়ে বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত বলেন, অমুকের সংগ্রহের চাইতে তোমার সংগ্রহ অনেক নিম্নস্তরের।

এই সময়ে প্রশান্তবাবু বলিলেন, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না। আপনি তথাকথিত গ্রাম-গানগুলির বিষয়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখে গুরুদেবের নিকট দাখিল করুন। গুরুদেব ওর উপরে মন্তব্য লিখে দিলে লেখাঁটি গুরুদেবের মন্তব্য সহ সীল করে রাখা হবে। এর পর বহু বৎসর পরে প্রয়োজন হলে গুরুদেবের মন্তব্য সহ প্রবন্ধটি সাধারণের দরবারে হাজির করা যাবে।

এই প্রস্তাবে কবি রাজি হইলেন। ইহার পর নানা কাজের ঝাটে আমি প্রবন্ধটি লিখিয়া কবিকে পাঠাইতে পারি নাই।

কবির সংকলন-পুস্তক ইহার কিছুদিন পরেই বাহির হয়। এই সংকলনে কবি ময়মনসিংহ-গীতিকা হইতে অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছেন। ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগ্রহ হইতেও কিছু কিছু লইয়াছেন।

রিপন কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদ খালি হইল। এই পদের জন্য আমি দরখাস্ত করি। তখন রিপন কলেজের কার্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী। শুনিতে পাইলাম, রবীন্দ্রনাথ এই পদের জন্য একজনকে সমর্থন করিয়া জে, চৌধুরীর নিকট সুপারিশ পত্র দিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা ল-রিপার্টের সম্পাদক ছিলেন হাইকোর্টের বিদায়ী প্রধান বিচারক শ্রদ্ধেয় এফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় তখন তরুণ এডভোকেট, শ্রীযুক্ত চৌধুরীর সহকারী। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। আমার সঙ্গে

মাঝে মাঝে গ্রাম্য-গান লইয়া আলোচনা করিতেন। রিপন কলেজের এই কাজটি যাহাতে আমার হয়, সেজন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি এম. এ. পাশ করিলাম ১৯৩১ সনে, কিন্তু ১৯৩৭ সন পর্যন্ত কোথাও কোন চাকুরী পাইলাম না। কোনও বাংলার ভাল পদ খালি হইলে সেই পদের সঙ্গে কিছু সংস্কৃত পড়ানোর কাজও জুড়িয়া দেওয়া হইত। সুতরাং কোন গভর্নমেন্ট-কলেজে চাকুরী পাইবার দরখাস্ত করার সুযোগ মিলিত না। বেসরকারী কলেজে বাংলা পড়ানোর পদ খালি হইলে তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন। শিক্ষাকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করারও আমি কোন সুযোগ পাইলাম না। তা ছাড়া কোন কলেজের চাকুরীর তদ্বির করার মত আমার কোন অভিভাবকও ছিল না। কিন্তু রিপন কলেজের চাকুরীর জন্য ফণীবাবু ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার জন্য বহুভাবে তদ্বির করিয়াছিলেন। একদিন ফণীবাবু আমাকে বলিয়াদিলেন, তুমি যদি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নামে কোন সুপারিশ-পত্র আনিতে পার, তবে এখানে তোমার চাকুরী হইতে পারে। এই বিষয়ে আমি ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে আলাপ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কর। নিশ্চয় তিনি তোমাকে সুপারিশ পত্র দিবেন। আমি শান্তিনিকেতনে রওনা হইলাম।

রবীন্দ্রনাথ তখন শ্যামলী নামক গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শিল্পী নন্দলাল মাটি দিয়া কবির জন্য এই সুদৃশ্য গৃহটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

কবি অনেকগুলি কাগজপত্র বিছাইয়া লেখাপড়ার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। হাসিয়া সস্নেহে আমাকে গ্রহণ করিলেন। কুশলপ্রশ্নের পর আমি কবিকে আমার আগমনের কারণ বলিলাম। কবি উত্তর করিলেন, দেখ, আমার চিঠিতে কারো কোন কাজ হয় না। তুমি মিছামিছি কেন আমার চিঠির জন্য এতদূর এসেছ? আমি সবিনয়ে উত্তর করিলাম, এই

কাজের জন্য আপনি অপরকে সুপারিশপত্র দিয়েছেন। আমার যদি এখানে কাজ না হয় তবে মনে করব, আপনার চিঠির জন্যই এখানে আমার কাজটি হল না।

কবি আমার কথার কোনই উত্তর দিলেন না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষার জন্য কতকগুলি ইংরেজী শব্দের বাংলা তর্জমা করিতেছিলেন। তাহা হইতে দুই একটি শব্দের বাংলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাহার সঠিক উত্তর দিতে পারিলাম। তখন কৌশলে আমি আবার সেই ব্যক্তিগত পত্রের কথা উল্লেখ করিলাম। কবিকে বলিলাম, অতদূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আপনি সমুদ্র। এখানে এসে আমি শূন্য হাতে ফিরে যাব, এ দুঃখ আমার চির-জীবন থাকবে। কবি একটু হাসিয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী অনিল চন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ, মাইল্ড গোছের একটি চিঠি লিখে এনে দাও। ও কিছুতেই ছাড়বে না।

অনিলবাবু ইংরেজীতে একটি চিঠি লিখিয়া আনিলেন, তাহাতে আমার গুণপনার পরিচয় দিয়া লিখিলেন, আমার উপর যেন সুবিচার করা হয়। যদিও ঐটি ব্যক্তিগত পত্র, তবু এখানে আমার জন্য বিশেষ কোন সুপারিশ করা হইল না। তাই কবিকে ধরিলাম, এখানে বাংলা করে লিখে দিন, জসীমউদ্দীনের যদি এখানে কাজ হয় আমি সুখী হব। কবি হাসিতে হাসিতে তাহাই লিখিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথও আমার জন্য সুপারিশ করিয়া শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নামে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র আনিয়া শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়কে দিলাম।

রিপন কলেজে সেবার আমার চাকুরী হইল না। রবীন্দ্রনাথ আগে যাহাকে ব্যক্তিগত পত্র দিয়াছিলেন, তাহার চাকুরী হইল। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের পত্রের জন্য তাহার চাকুরী হয়

নাই। তাহার চাকুরী হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাহার স্থান আমার উপরে ছিল বলিয়া। তবে আমার মত সাহিত্যিক খ্যাতি তাহার তখনও হয় নাই। ধূর্জটিপ্রসাদ এবং ফণীবাবুর চেষ্টায় এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রের গুণে রিপন কলেজের কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে আপাতত রিপন ইস্কুলের একটি মাস্টারী দিতে চাহিলেন এবং বলিলেন, এর পরে নতুন কোন পদ খালি হইলে আপনাকে আমরা কলেজের সামিল করিয়া লইব। আমি তাহা গ্রহণ করি নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সেবার গবেষক নিয়োগ করা হয়। সেটা বোধ হয় **১৯৩২** সন। তখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা বিভাগের প্রধান কর্তা। শুনিলাম, পাঁচজনকে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাহার শান্তিনিকেতনের দুইজন ছাত্রের জন্য সুপারিশ করিবেন। বাকি তিনজনের মধ্যে অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের নিজস্ব লোক রহিয়াছে।

সুতরাং আমার সেখানে সূচ্যগ্র-প্রবেশেরও আশা নাই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটহীন রাজা। আমি গিয়া রবীন্দ্রনাথকে ধরিলাম। গ্রাম্য-গান নিয়ে আমি কিছু কাজ করেছি। গবেষকের কাজটি যদি পাই, আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারি।

কবি হাসিমুখে আমার জন্য শ্যামাপ্রসাদকে একখানা সুপারিশ-পত্র লিখিয়া দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পত্রের গুণে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহৎপ্রাণ মিণ্টো-প্রফেসার ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী ও স্যার হাসান সারওয়ার্দীর চেষ্টায় আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপ-গবেষক নিযুক্ত হইলাম। নিয়োগপত্র পাইয়াই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম, "আপনার পত্রের জন্যে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পেয়েছি।"

কবি বলিলেন, 'তুমি আমাকে বড়ই আশ্চর্য করে দিলে হে। আমার কাছে কেউ কোন উপকার পেয়ে কোন দিন তা স্বীকার করে না।'

তখনকার দিনে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া ছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার এতটুকুও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যখনই যেজন্য তাহার নিকটে গিয়াছি, তিনি হাসিমুখে তাহা করিয়া দিয়াছেন। মুসলমান বলিয়া তিনি আমাকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিব।

স্যার এফ রহমান সাহেব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার। তিনি আমাকে বলিলেন, রবীন্দ্রনাথ অথবা অন্য কোন নামকরা লোকের কাছ থেকে যদি কোন ব্যক্তিগত পত্র আনতে পার, তবে এখানে বাংলা-বিভাগে তোমার জন্য কাজের চেষ্টা করতে পারি। এম, এ, পাশ করিয়া তখন বহুদিন বেকার অবস্থায় চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমি তৎক্ষণাৎ কলিকাতা চলিয়া আসিলাম।

কলিকাতা আসিয়া বাংলা-সাহিত্যের দুইজন দিকপালের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহারা কেহই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিয়োগ সমর্থন করিয়া কোন পত্র দিতে চাহিলেন না। একজন তো স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, 'দেখ, আজকাল সাম্প্রদায়িকতার দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শত্রুর অভাব নাই। হয়ত কোন হিন্দু এই কাজের জন্য চেষ্টা

করছে। তোমাকে ব্যক্তিগত পত্র দিলে হিন্দু কাগজগুলি আমাকে গাল দিয়ে আস্ত রাখবে না।

আমার তখন দুঃখে ক্ষোভে কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। এরা আমাকে এত ভালবাসেন। আমি বেকার হইয়া চাকরীর জন্য কত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এরা একটা চিঠি দিলেই আমার কাজ হইয়া যাইত। অথচ যে হিন্দু প্রার্থীকে এরা চেনেন না, তারই সমর্থনে আমার ব্যক্তিগত পত্র দিলেন না। একবার ভাবিলাম, রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই। তিনি হয়ত আমাকে ব্যক্তিগত পত্র দিবেন। আবার ভাবিলাম, হয়ত তিনিও এদেরই মত আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। কী কাজ তাঁহার নিকটে গিয়া!

স্রোতে-পড়া লোক তৃণের আশাও ছাড়িতে চাহে না। আশার ক্ষীণ সূত্রটি কিছুতেই মন হইতে টুটিতে চাহে না। কে যেন আমাকে ঠেলিয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া চলিল।

সকালবেলা। কবি বারান্দায় বসিয়াছিলেন। পূর্ব গগনে রঙ্গিলা ভোর মেঘে মেঘে তার নক্সার কাজ তখনও বুনট করিয়া চলিয়াছে। সামনের বাগানে পাখির গানে ফুলের রঙে আর সুবাসে আড়াআড়ি চলিয়াছে। সালাম জানাইয়া কবির সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। কুশলপ্রশ্নের উত্তর দিয়া কবিকে আমার আগমনের কথা বলিলাম। কবি তৎক্ষণাৎ তার প্রাইভেট-সেক্রেটারী অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়কে আমার জন্য একখানা সুপারিশপত্র লিখিয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। তখন আমি কবিকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। কলিকাতার দুইজন সাহিত্যের দিকপাল শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক কারণে আমাকে যে সুপারিশ-পত্র দেন নাই, এ কথাও বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া কবি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন।

বন্ধুবর অজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিচের তলায় কয়েকখানি কুঠরী ভাড়া লইয়া আমি প্রায় বৎসর খানেক ঠাকুরবাড়িতে ছিলাম। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিলে প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। তখন কোন দিন কবির সঙ্গে কী আলাপ হইয়াছিল, স্পষ্ট মনে নাই। কয়েকটি টুকরো কথা উজ্জ্বল উপলখণ্ডের মত মনের নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি।

একদিন কথা প্রসঙ্গে কবি বলিলেন, দেখ, আমার বিষয়ে লোকে যখন তখন যা-কিছু লিখতে পারে। কেউ কোন উচ্চবাচ্য করে না।

আমি বলিলাম, 'আপনি কবি, সাহিত্যিক,—আপনাকে নিন্দা করেও সাহিত্য তৈরী হয়। তাই আপনার নিন্দা করা সহজ। কিন্তু একথা নিশ্চয় জানবেন, দেশের শতসহস্র লোক আপনার কবিতা পড়ে আনন্দ পায়—আপনাকে শ্রদ্ধা করে। শ্রদ্ধা অন্তরে অনুভব কববার বস্তু। নিন্দার মত শ্রদ্ধা বাহিরে তত মুখর নয়। আপনাকে যারা শ্রদ্ধা করে আপনি তাদের দেখেন নি।'

কবি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে উত্তর করিলেন, দেখ মহাত্মা গান্ধীকে ত কেউ নিন্দা করতে সাহস করে না।

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, 'মহাত্মা গান্ধী বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেও তাঁকে নিন্দা করলে সাহিত্য তৈরী হয় না। আপনার সঙ্গে আপনার নিন্দুকেরাও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়। ছুছুন্দরী কাব্যের লেখকের নাম আজ কে মনে রাখত যদি মাইকেলের অমর কাব্যের সঙ্গে এই কাব্য জড়িত না থাকত?

এই আলোচনার পরে দেশে এমন দিনও আসিয়াছিল, যে জনতা গান্ধীজীকে মহাত্মা না বলিলে ক্ষেপিয়া যাইত, তাহারাই তাহার গায়ে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছে—তাহার গাড়ি আক্রমণ করিয়াছে। পরিশেষে সেই জনতার একজনের হাতেই গান্ধীজীকে জীবন পর্যন্ত দিতে হইল।

ঠাকুর-বাড়িতে থাকিলে এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে আমরা অনেক আজব কাণ্ড করিতাম। এই সুখী পরিবার কোনকিছু উপলক্ষ করিয়া হাসিতামাসার সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়িত না। আমার কোন কবিবন্ধুকে ঠাট্টা করিয়া কবিতায় একটি পত্র লিখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কোন কৌশলে তাহা বন্ধুবরের পকেটে রাখিয়া আসিব। ঠাকুরবাড়ির একটি ছোট ছেলে ছো মারিয়া সেটা লইয়া গিয়া এনভেলপে ভরিয়া রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা লিখিয়া কবিকে দিয়া আসিল। আমি ত ভয়ে বাঁচি না। একে কবিতাটি রচনা হিসেবে একেবারে কাঁচা, তাহা ছাড়া বন্ধুকে লইয়া যে বিদ্রুপ করিয়াছি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে লইয়া তাহা পারা যায় না। কবি না জানি আমাকে কি বলিবেন? আমার শিল্পীবন্ধু ঋতীন্দ্রনাথ ঠাকুর গিয়া কবিকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। কবি আমাকে ডাকাইয়া লইয়া বলিলেন, এতে তুমি এত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ কেন? আমি কিছু মনে করি নি, বরঞ্চ বেশ আনন্দ পেয়েছি। তারপর যাহাতে এজন্য আমার মনে লেশমাত্র অনুতাপ না থাকে—কবি সস্নেহে আমার সঙ্গে অনেক গল্প করিলেন। অতি-আধুনিক কবিদের বিষয়ে আলোচনা হইল। আমি বলিলাম, আজকাল একদল অতি-আধুনিক কবির উদয় হয়েছে। এরা বলে, সেই মান্ধাতার আমলের চাঁদ, জোছনা ও মৃগনয়নের উপমা আর চলবে না; নতুন করে উপমা-অলঙ্কার গড়ে নিতে হবে। গদ্যকে এরা কবিতার মত করে সাজায়। তাতে মিল আর ছন্দের আরোপ বাহুল্যমাত্র। এলিয়টের আর এজরা পাউণ্ডের

মত করে এরা লিখতে চায়। বলুন ত একজনের মতন করে লিখলে তা কবিতা হবে কেন? কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যদি না থাকল তার প্রকাশে, তাকে কবি বলে স্বীকার করব কেন? দিনে দিনে এদের দল বেড়ে যাচ্ছে। এরা অনেকেই বেশ পড়াশুনো করে। বিশেষ করে ইংরেজী-সাহিত্য। তারই দৌলতে এরা নিজের দলের স্বপক্ষে বেশ জোরাল প্রবন্ধ লেখে।

কবি বলিলেন, 'এজন্য চিন্তা করো না। এটা সাময়িক ঘটনা। মেকির আদর বেশী দিন চলে না। একথা জেনো, ভাল লেখকদের সংখ্যা সকল কালেই খুব কম। আর মন্দ লেখকেরা সংখ্যায় যেমন বেশী, শক্তির দাপটে তেমনি অজেয়। কিন্তু কালের মহাপুরুষ চিরকালই সেই অল্পসংখ্যক দুর্বল লেখকদের হাতে জয়পতাকা তুলে দিয়েছেন।'

আজ বহুদিন পরে মনের অস্পষ্ট স্মৃতি হইতে এইসব কথা লিখিতেছি। উপরের কথাগুলি কবি ঠিক এইভাবেই যে বলিয়াছিলেন, তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারি না।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের গানের তেমন আদর হয় নাই। রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড হইলে দুই-শ আড়াই-শর বেশি বিক্রয় হইত না। একদিন কবির সঙ্গে তার গানের সুরের বিষয়ে আলোচনা হইল। আমি বলিলাম, 'আজকাল আধুনিক গায়কেরা আপনার গান গাইতে চায় না। আপনার গানের ভিতরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য আছে, তা আমাদের অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ গায়কেরা সেই সূক্ষ্ম কারুকার্যের আদর করিতে জানে না। তারা গানের সুরে স্থূল ধরনের কারুকার্য চায়। যা হলে শ্রোতারা বাহবা দিতে পারে। তাই দখতে পাই, আপনার গানের ভাষার অনুকরণে যারা গান লেখে, সেই সব গানে স্থূল ধরনের সুর লাগিয়ে তারা আসর সরগরম করতে চায়। কবি

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ‘এটাও একটা সাময়িক ব্যাপার। এগুলোর আদর বেশী দিন টিকবে না।’

একবার কথাপ্রসঙ্গে কবিকে বলিলাম, ‘আপনার কবিতার ভাষায় এমন অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গ তোলে—কোথাও এমন একটি শব্দ আপনি ব্যবহার করেন নি, যেটাকে বদলিয়ে আর একটি বসান যায়। এত লখেছেন, কোন লেখার একটি শব্দও মনে হয় না অস্থানে পড়েছে। আপনার ঐ যে গান–

গ্রামছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ
ওরে, আমার মন ভুলায় রে—

কী সুন্দর রহস্যলোকে মন উধাও হয়ে যায় শব্দের আর সুরের পাখায়। কিন্তু যেখানটিতে আপনি লিখেছেন,

সে যে আমায় নিয়ে যায় রে
নিয়ে যায় কোন চুলায় রে—

এখানে চুলায় কথাটি শুনতে কল্পনার আকাশখানি যেন মাটিতে পড়ে যায়।’

কবি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ‘তা চুলোয় বলছি তো হয়েছে কি? কথাটি তোদের বাঙাল দেশে হয়ত তেমন চলে না। অথবা অন্য ভাবে আছে।’



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কবির সঙ্গে তাঁর আরও কোন কোন কবিতার আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলাম। কবি আমাকে বলিলেন, যা, এখন যা। আমার অনেক কাজ আছে। আগে তুই প্রফেসর হ, তখন এসব

তোকে বলব।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ছাপা হইলে কবিকে পড়িতে দিলাম।

পড়িয়া তিনি খুব প্রশংসা করিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি যদি এই বই-এর বিষয় কিছু লিখে দেন, আমি ধন্য হব"।

শান্তিনিকেতনে গিয়া কবি পত্র লিখিলেন—'তোমার সোজন বাদিয়ার ঘাট অতীব প্রশংসার যোগ্য। এ বই যে বাংলার পাঠকসমাজে আদৃত হবে সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।'

কবির ঐ ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। বই খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। ইউনেস্কো হইতে ইংরাজি অনুবাদও শীঘ্র বাহির হইবে।

আমার পাশ্ববর্তী গ্রামের একটি মুসলমান চাষী ভাল বাঁশী বাজাইতে জানিত। কতদিন তাকে ডাকিয়া আনিয়া আমাদের পদ্মাতীরের বাড়িরধারে বাঁশঝাড়ে সারারাত জাগিয়া বাঁশী শুনিয়াছি। ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া নিজের ইচ্ছামত ছিদ্র তৈরি করিয়া সে তার হাতের বাঁশী তৈরি করিয়াছিল। হারমোনিয়ামের সা-রে-গা-মা-র সঙ্গে বাঁশীর ছিদ্রগুলির কোনই মিল ছিলনা। কিন্তু বিচ্ছেদ, বারমাসী ও রাখালী সুরের সবখানি মধু বাঁশীতে সে ঢালিয়া

দিতে পারিত। গভীর রাত্রিকালে সে যখন বেহুলাসুন্দরীর গান ধরিত, তখন যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম, আমাদেরই পদ্মা নদী দিয়া কলার মান্দাসে অভাগিনী বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে লইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

নিজের বাড়িতে সে বাঁশী বাজাইতে পারিত না। বাড়ির মেয়েরা বাঁশীর সুরে উদাসী হইয়া যাইবে বলিয়া গ্রামবাসীরা তাহাকে ধরিয়া মার দিত। গভীর রাতে যখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িত, তখন সে গ্রাম হইতে বাহিরে আসিয়া মাঠের মধ্যস্থলে বসিরা বাঁশী বাজাইত। তাহার বাঁশীতে 'জল ভর সুন্দরী কন্যা' গানটি শুনিয়া কোন যুবতী নারী নাকি একদিন ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

এই গুণী লোকটি ছিল আমার আত্মার আত্মীয়। দেশে গিয়া প্রায়ই তাহাকে ডাকিয়া তাহার বাঁশী শুনিতাম। মনে হইল, এমন গুণী লোককে কলিকাতা লইয়া গেলে সেখানকার লোকে নিশ্চয় উহার বাঁশী শুনিয়া তারিফ করিবে।

কালা মিয়াকে কলিকাতা আনিয়া গ্রামোফোন কোম্পানিগুলিতে অনেক ঘোরাঘুরি করিলাম। কেউ তার বাঁশী রেকর্ড করিতে চাহিল না। নাট্টাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে একদিন তার বাঁশী শুনাইলাম। গুণীজনের সমাদর করিতে তাঁর মত আর কেহ জানিত না। বাঁশী শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। তার অর্কেস্ট্রাতে কালা মিয়াকে বাজাইবার হুকুম দিলেন। কিন্তু দিলে কি হইবে? অর্কেস্ট্রার বাজিয়েদের সুরের সঙ্গে বাঁশীর সুরের পর্দা মেলেনা। কারণ অর্কেস্ট্রার একটি পদ খালি হইলেই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে আনিয়া বসাইতে পারে, তাই তারা আপদবিদায় হইলে বাঁচে। যদি তারা সময় দিত, এই গ্রাম্য যুবকটিকে স্নেহমমতার সঙ্গে তাহাদের যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করাইত, সে হয়ত পরিণামে

তাহাদের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাঁশী বাজাইতে পারিত। বাঁশী বাজিয়ে অভিযোগ করিতে লাগিল। শিশিরবাবু বিরক্ত হইরা তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথকে এই বাঁশী আগেই শুনাইয়াছি। তিনি খুব তারিফ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের জমিদারী তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে যাইতেছে। টাকা-পয়সার দিক দিয়া তিনি কোনই সাহায্যকরিতে পারিবেন না। আগেকার দিন হইলে এককথায় হাজার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। ভাবিলাম, রবীন্দ্রনাথকে বাঁশী শুনাইব। যদি তাহার ভাল লাগে, হয়ত তিনি তাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া যাইবেন।

আমার সকল নাট্যের কাণ্ডারী মোহনলালের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কবিকে এই বাঁশী শুনাইবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখন থাকিতেন পূবের দোতলায়। অবনীন্দ্রনাথের বাড়ির উত্তরের গাড়ি-বারান্দার দোতালায় কালা মিয়াকে বসাইয়া বাঁশী বাজাইতে বলিলাম। কালা মিয়া বাঁশীতে সুর দিয়া বাজাইয়া চলিল—“রাধা বলে ভাইরে সুবল আমি আর কত বাজাব বাঁশী। আমরা নিচে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথের আনাগোনা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বাঁশী শুনিয়া কবির ভাবান্তর জানিবার জন্য মোহনলালের দাদামশাই সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আগেই রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কালা মিয়া আবার বাঁশীতে গান ধরিল :

জাইত গেল বাইদার সাথে
জাইত গেল কুল গেল ভাঙল সুখের আশা
ওরে, রজনী পরভাতের কালে পাখী ছাড়ল বাসা রে—

বিলম্বিত সুরের মুর্ছনা আকাশ-বাতাস আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দার উপর দাঁড়াইলেন। কয়েক মিনিট থাকিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। সমরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমরা জানিতাম, এই বাঁশী শুনিয়া কবি খুবই খুশি হইবেন। সেই কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম। সমরেন্দ্রনাথের কাছে শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, দেখ ত কে আমাকে এই সকালবেলা এমন একঘেয়ে করুণ সুরের বাঁশী শুনায়। সকালবেলা কি এই সুর শোনার সময়? এই কথা শুনিয়া মনে মনে খুবই ব্যথা পাইলাম। বুঝিলাম এই বাঁশী শোনার মনোভাব কবির তখন ছিল না। অন্য সময় যদি শুনাইতে পারিতাম, কবি হয়ত বাঁশী পছন্দ করিতেন। কালু মিয়া দেশে ফিরিয়া গেল। কলিকাতার কোন গুণগ্রাহী এই মহাগুণীর আদর করিল না। দেশে গিয়া সে রিক্সাচালকের কাজ করিত। অমানুষিক পরিশ্রম ও অল্প আহারে যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হইয়া সে চিরকালের মত ঘুমাইয়াছে। তাহার মত অমন মধুর বাঁশীর রব আর কোথাও শুনিতে পাইব না।

আজ পরিণত বয়সে বুঝিতেছি যে, কবি কোন দিনই এই বাঁশী শুনিয়া আমাদের মতন মুগ্ধ হইতেন না। কবি যখন সাহিত্য আরম্ভ করেন, তখন সমস্ত দেশ পল্লীগানে মুখর ছিল। কালা মিয়ার চাইতে সহস্রগুণের ভাল বাঁশী-বাজিয়ের সুর তিনি শুনিয়াছিলেন। লোক-সাহিত্যের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা ছাড়া তাহাদের সুর বা কৃষ্টি রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ কিছুই করেন নাই। ইংরেজ-আগমনের সময় আমাদের বাংলা সাহিত্য ছিল জনসাধারণের। বিদেশি সাহিত্যের ভাবধারা আর প্রকাশ-ভঙ্গিমার উপর পল্লব মেলিয়া নব্য বাঙালিরা যে সাহিত্য তৈরি করিলেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া সে সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হইল। পরলোকগত চিত্তরঞ্জনের অনুগামীরা ছাড়া সমস্ত দেশ বিস্ময়ে এই মহাস্রষ্টার পায়ে প্রণামাঞ্জলি রচনা করিল। সমস্ত কথা বলিবার সময় এখনো

আসে নাই। আর ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াই বা কি হইবে। আমি রবীন্দ্রস্মৃতিকথা লিখিতেছি। একবার গ্রাম-গানের বিষয়ে কবির সঙ্গে আলাপ হইল। কবি বলিলেন, “দেখ, তোমাদের গ্রাম্যগানের সুর হুবহু শেখার সুযোগ আমার হয় নি। যা একটু সুরের কাঠামো পেয়েছি, তার সঙ্গে আমার সুর মিশে অন্য একটা কিছু তৈরি হয়েছে।’

আমি বলিলাম, ‘সেই জন্যই আপনার বাউল-সুরের গানগুলির অনুরূপ সুর আমি কোথাও খুঁজে পাইনে।’

কবি বলিলেন, ‘তুমি কিছু খাঁটি গ্রাম্য সুর আমার শান্তিনিকেতনের মেয়েদের শিখিয়ে দিও। তাদের কাছ থেকে আমি শুনব।’

তখন আমার মনে হইয়াছিল, পাছে আমি নিজেই আমার হেড়ে গলায় কবিকে গান শুনাইতে চাহি সেইজন্য কবি আগেভাগে আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। অভিনয়ে সংগীতে আবৃত্তিতে তিনি সর্বসুন্দর ছিলেন। আর্টের এতটুকু দুর্গতি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। আজ মনে হইতেছে, তিনি হয়ত সত্যসত্যই গ্রাম্যগানের একটি ক্ষুদ্র দল তাঁর গায়িকাদের নিয়ে পড়তেন। যেমন তিনি ওস্তাদি গান নিয়ে পড়েছিলেন।

কবি যখম আমার সঙ্গে কথা বলিতেন, মনে হইত, তিনি যেন কোন শিশুর সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কখনো তুমি বলিতেন, কখনো তুই বলিতেন। কবির কাছ হইতে যখন ফিরিয়া আসিতাম, মনে হইত কোন মহাকাব্য পাঠ করিয়া এই ক্ষণে উঠিয়া আসিতেছি। সেই মহাকাব্যের সুরলহরী বহুদিন অন্তরকে সুখস্বপ্নে ভরিয়া রাখিত। তার নিকট হইতে

আসিলেই মনে হইত, কী যেন অমূল্য সম্পদ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আপন-পরের জ্ঞান তার থাকিত না। তাঁর ভক্তেরা দিন-রজনী পাহারা দিয়াও কবির নিকটে পর-মানুষের আসা ঠেকাইয়া রাখিতে পারি না। কেহ দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে জানিলে কবি বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। সেইজন্য তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী দিনে দিনে বাড়িত। পুরাতনেরা নূতনকে বাধা দিতে পারিত না। কবির অসুখবিসুখ হইলে তাহার শুভানুধ্যায়ীরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন, অভ্যাগত কেহ আসিলে পাছে কবি তাহা জানিয়া ফেলেন। কারণ ডাক্তারের নিষেধ কবির সঙ্গে যেন কেহ দেখা না করে। এত যে ব্যস্ত থাকিতেন তিনি, কিন্তু প্রত্যেকখানা পত্রের উত্তর দিতেন। আমাদের বিবাহের আগে কবিকে নিমন্ত্রণ করিলাম। কবি একটি সুন্দর আশীর্বাদপত্র রচনা করিয়া পাঠাইলেন।

অনেক সময় কবির কাব্য আর কবিকে ভাবি। আমার মনে হয়, কবির জীবনে কিছু শক্তি আর অর্থের অপচয় ঘটিয়াছে তার শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী পরিগঠনে। এ কাজ কবি না করিলেও অপরে করিতে পারিত। এই দুটো প্রতিষ্ঠান না থাকিলে কবি হয়ত আরও অনেক সাহিত্যিক দান রাখিয়া যাইতেন। সারা পাকভারতে আজ রবীন্দ্রনাথের কোন উত্তরাধিকারী নাই। এমন সাহিত্যপ্রতিভা কোথাও দেখি না যে রবীন্দ্রনাথের ধারেকাছেও যাইতে পারে। বিশ্বভারতী আর শান্তিনিকেতনের কাজে কবির বহু সময় ব্যয় হইয়াছে। সেই সময় হয়ত তিনি তার সমধর্মী সাহিত্যিকদের জন্য দিতে পারিতেন। সমালোচনা করিয়া ভুলত্রুটি দেখাইয়া সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে তিনি বড় সাহিত্যিক রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। যেমন করিয়াছিলেন তিনি তাহার প্রথম যৌবনে।

যাহা হয় নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

কবি চলিয়া গিয়াছেন সুদীর্ঘকাল। বহু ব্যক্তি বহুভাবে কবির সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। কবির মৃত্যু নাই একথা সত্য কিন্তু কবির সংস্পর্শে আসার সুযোগ যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের মনের শুন্যতা কেহ কোনদিন পূরণ করিতে পারিবে না।

# অবন ঠাকুরের দরবারে

কলিকাতা গেলেই আমি কল্লোল-আফিসে গিয়া উঠিতাম। সেবার কলিকাতা গেলে কল্লোলের সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ আমাদের সকলকার দীনেশদা বলিলেন অবনীন্দ্রনাথ তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কাল তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। কল্লোলে প্রকাশিত তোমার মুর্শিদা-গান প্রবন্ধটি পড়ে তিনি খুশি হয়েছেন।–

পরদিন সকালে আমরা ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। ঠাকুরবাড়ির দরজায় আসিয়া দীনেশা কার্ডে নাম লিখিয়া দরওয়ানের হাতে উপরে পাঠাইয়া দিলেন। আমি উপরে ওঠার সিঁড়ির সামনে দাঁড়াইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি—প্রবাসীতে যার 'শেষ বোঝা' চিত্র দেখিয়া ঘণ্টার পর ঘন্টা কাটাইয়া দিয়াছে। সীমাহীন মোহময় মরুপ্রান্তরে একটি উট বোঝার ভারে নুইয়া পড়িয়া আছে। সেই করুণ গোধুলির আসমানের রঙ আমার মনে কেমন যেন এক বিরহের উদাসীনতা আঁকিয়া দিত। রঙের আর রেখার জাদুকর সেই অবন ঠাকুরের সঙ্গে আজ আমার দেখা হইবে। উপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ির দুই ধারে রেলিংয়ের উপর কেমন সুন্দর কারুকার্য। নানা রকমের ছবি। একপাশে একটি ঈগলপাখি। এরা যেন আমার সেই কল্পনাকে আরও বাড়াইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া আমাদিগকে সেই সিঁড়ি-পথ দিয়া উপরে লইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া একখানা ঘর পার হইয়া দক্ষিণ ধারের বারান্দা। সেখানে তিনটি বৃদ্ধলোক ডান ধারের তিনটি জায়গায় আরামকেদারায় বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে

কোন কথা নাই। কোথাও টু-শব্দটি নাই। দুই জন ছবি আঁকিতেছেন, আর একজন বই পড়িতেছেন। প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া আলবোলা। খাম্বিরা তামাকের সুবাসে সমস্ত বারান্দা ভরপুর। ডানধরে উপবিষ্ট শেষ বৃদ্ধ লোকটির কাছে আমাকে লইয়া গিয়া দীনেশদা বলিলেন, "এই যে জসীম উদ্দীন। আপনি এর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন।

ছবি আঁকা রাখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন এসো, এসো, সামনের মোড়টা টেনে নিয়ে বস।

আমরা বসিলাম। দীনেশা আমার কানে কানে বলিলেন, ইনিই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; আর ওপাশে বসে ছবি আঁকছেন, উনি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি বই পড়ছেন, উনি সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরা তিনজনে সহোদর ভাই।

হুঁকোর নল হইতে মুখ বাহির করিয়া অবন ঠাকুর বলিলেন, 'তোমার সংগৃহীত গানগুলি পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার প্রবন্ধে এর একটা গান উদ্ধৃত করেছি, এই যে–

এক কালা দতের কালি
যাদ্যা কলম লিখি,
আরো কাল চক্ষের মণি
যাদ্যা দৈনা দেখি—

এ গুলি ভাল, আরও সংগ্রহ কর। এক সময় আমি এর কতকগুলি সংগ্রহ করিয়েছিলাম।

এই বলিয়া তিনি তার বইপত্র খুলিয়া একখানা নোট বই বাহির করিলেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, কত আগে অবনবাবু তার কোন ছাত্রের সাহায্যে যশোর ও নদীয়া জেলা হইতে অনেকগুলি মুর্শিদা-গান সংগ্রহ করাইয়াছেন।

দীনেশদা অবনবাবুকে, বলিলেন, 'জসীমের মুর্শিদা-গানের সংগ্রহ আমার কাগজে ছাপিয়েছি। অনেকে বলে, এগুলো ছাপিয়ে কি হবে?'

অবনবাবু বলিলেন, 'মশাই, ও সব লোকের কথা শুনবেন না। যত পারেন, এগুলো ছেপে যান। এর পরে এগুলো আর পাওয়া যাবেনা।'

তারপর নানা রকমের গ্রাম-গানের বিষয়ে আলাপ হইল। কবিগান যাত্রাগান জারীগান কোথায় কি ভাবে গাওয়া হয়, কাহারা গায়, কোথায় কোন গাজীর গানের দল ভাল রূপকথা বলে, শিশুর আগ্রহ লইয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উত্তর দিতে আমার এমনই ভাল লাগিল!

কিশোর বয়স্ক একটি ছেলে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এক বৎসর আগে এর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। দীনেশা প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" বইখানার অভিনয় পরিচালনা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া অভিনয় দেখি। আমার পাশে একটি ছোট্ট খোকা আসিয়া বসিল। অপরের সঙ্গে আলাপ করিবার তাহার কী আগ্রহ। সে-ই আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলিল। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কি করি ইত্যাদি। হয়ত সেই আলাপে নিজের পরিচয়ও দিয়াছিল। তার কথা একদম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। খোকা আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া সেই

পরিচয়ের সূত্রটি ধরাইয়া দিল। অবনবাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কল্লোল-অফিসে ফিরিয়া আসিলাম।

অবনবাবুর বাড়িতে যে গল্পটি বলিব ঠিক করিয়াছিলাম, সারাদিন মনে মনে তাহা আওড়াইতে লাগিলাম। এই গল্প আমি কতবার কত জায়গায় বলিয়াছি। সুতরাং গল্পের কোন কোন জায়গা শুনিয়া ঠাকুরবাড়ির শ্রোতারা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইবেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলাম।

বিকালবেলা দীনেশার জরুরী কাজ ছিল। আমাকে সঙ্গে লইয়া অবনবাবুর বাড়ি চলিলেন পবিত্বদা। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। অবনবাবুর বাড়ি আসিয়া দেখি—সে কী বিরাট কাণ্ড! রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-ঘরের হলে গল্পের আসর বসান হইয়াছে। বাড়ির যত ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী সকলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে গল্প শুনিতে। অবনবাবুর দুই ভাই গগনেন্দ্রনাথ আর সমরেন্দ্রনাথ আগেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আরও আসিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সকল সুরের কাণ্ডারী আর সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ। গল্পের আসরের উপলক্ষ করিয়া হলটিকে একটু সাজান হইয়াছে। কথক ঠাকুরদের মত সুন্দর একটি আসনও রচিত হইয়াছে আমার জন্য।

এসব দেখিয়া আমার চোখ ত চড়কগাছ! সুদূর গ্রামদেশের লোক আমি। জীবনে দুই-এক বারের বেশী কলিকাতা আসি নাই। শহরে হাঁটিতে চলিতে কথা কহিতে জড়ায় জড়াইয়া যাই। আজ এই আসরে আমি গল্প বলিব কেমন করিয়া? আমার বুকের ভিতরে ঢিপঢিপ

করিতে লাগিল। আমার ভয়ের কথা পবিত্বদাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তুই কোন চিন্তা করিসনে। যা জানিস বলে যাবি। এঁরা খুব ভাল শ্রোতা।"

পবিত্রদা সাহস দিলেন। কিন্তু আমার ভয় আরও বাড়িয়া গেল। সভা-স্থলে অবনবাবু আসিলেন। তিনি সহাস্যে বলিলেন, "দেখ, তোমার গল্প শোনার জন্য কত লোক এনে জড় করেছি। রবিকাকেও ধরে আনতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি একটি কাজে অন্যত্র চলে গেলেন। এরারে তবে তুমি আরম্ভ কর।"

বলির পাঠার মত আমি সেই আসনে গিয়া বসিলাম। পবিত্রদা আমার পাশে। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? সামনের দিকে চাহিয়া দেখি—রঙিন শাড়ীর ঝকমকি, সুগন্ধি গুড় আর সেন্টের গন্ধ। আমার বুকের দুরুদুরু আরও বাড়িয়া গেল।

অবনবাবু তাড়া দিলেন, "এবার তবে আরম্ভ হোক রূপকথা।"

আমার তখনও কলিকাতার বুলি অভ্যস্ত হয় নাই। কিছুটা কলিকাতার কথ্য ভাষায়, আর কিছুটা আমার ফরিদপুরের ভাষায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত,  
যাহার হাওয়ায় কাপে সকল গাছের পাত।  
পুবেতে বন্দনা করলাম পুবে ভানুশ্বর,  
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর।  
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা-মদিস্থান,  
উদ্দেশ্যে জানায় গো সালাম মমিন মুসলমান।

দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষীরনদীর সাগর,
যেখানে বাণিজ্য করে চান্দ সওদাগর।
চার কোণা বন্দনা কইরা মধ্যে করলাম স্থিতি,
এখানে গাব আমি ওতলা সুন্দরীর গীতি।

গল্প বলিতে বলিতে গল্পের খেই হারাইয়া ফেলি। পরের কথা। আগে বলিয়া আবার সেই ছাড়িয়া-আসা কথার অবতারণা করি। দশ-পনের মিনিট পরে দিমুবাবু উঠিয়া গেলেন। সামনে শাড়ীর ঝকমকিতে দোলায়া কৌতুকমতীরা একে অপরের কানে কানে কথা বলিতে লাগিলেন। কেউ কেউ উঠিয়া গেলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরেও পরিবর্তন হইতে লাগিল। কোন রকমে ঘামে নাহিয়া বুকের সমস্ত টিপটিপানি উপেক্ষা করিয়া গল্প শেষ করিলাম।

অবনবাবু বলিলেন, “বেশ হয়েছে।” কিন্তু কথাটা যে আমাকে শুধু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলিলেন, তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

দেশে ফিরিয়া মোহনলালের কাছে পত্র লিখিলাম। আবার আমি তোমাদের বড়ি গিয়া গল্প বলিব। যতদিন খুব ভাল গল্প বলা না শিখিতে পারি, ততদিন কলিকাতা আসিব না।

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যেখানে যে যত ভাল গল্প বলিতে পারে, তাহাদের গল্প বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ফরিদপুর ঢাকা তাহাদের ময়মনসিংহ জেলার যেখানে যে ভাল গল্প বলিতে পারে খবর পাইলাম, সেখানেই গিয়া উপস্থিত হইতাম। তারপর সেইসব গল্প বলার ভঙ্গি অনুকরণ করিয়া ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে বসিয়া গল্প বলিবার অভ্যাস

করিতে লাগিলাম। ছেলেদের খেলার মাঠের একধারে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমার গল্পের আসর বসিত। অধুনা কবিখ্যাত আবু নইম বজলুর রশীদ আমার গল্পের আসরের একজন অনুরক্ত শ্রোতা ছিল। এইভাবে গল্পের মহড়া চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। গল্প শুনিবার জন্য তখন কত জায়গায়ই না গিয়াছি। সুদূর ময়মনসিংহে ধনা গায়েনের বাড়ি গেলাম। কালীগঞ্জের মোজাফর গায়েনের বাড়ি গেলাম। টাকা খরচ করিয়া একদিন কালীগঞ্জের বাজারে তার গাজীর গানের আসর আহ্বান করিলাম।

মোজাফর গায়েনের গল্প বলার ভঙ্গিটি ছিল বড়ই চমৎকার। এক হাতে আশাসোটা আর একহাতে চামর লইয়া সে গল্পের গানের গোন গাইয়া দোহারদের ছাড়িয়া দিত। দোহারেরা সেই সুর লইয়া সমবেত কণ্ঠে সুরের-ধ্বনি বিস্তার করিত। তারপর ছড়ার মতো কাটাকাটা সুরে গল্পের কাহিনীগুলি বলিয়া যাইত। সুরে যে কথা বলিতে পারিত না, নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া চামর ঘুরাইয়া তাহা সে প্রকাশ করিত। দীনেশচন্দ্র সেন-সংকলিত ময়মনসিংহ-গীতিকায় সংগীত-রত সদলবলে মোজাফর গায়েনের একটি ফটো প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা আমি কোন ব্যবসায়িক ফটোগ্রাফারকে দিয়া তোলাইয়া লইয়াছিল। এই ফটোতে তখনকার বয়সের আমারও একটি ছবি আছে।

০২.

এই ভাবে সুদীর্ঘ এক বৎসর গল্প বলার সাধনা করিয়া আবার কলিকাতা অসিয়া প্রথমে মোহনলালের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতার একটি ছোটদের

স্কুলে গিয়া গল্প বলিলাম। গল্পের যে স্থানটি খুব করুণ রসের, দেখিলাম, সে স্থানটিতে ছোটদের চোখ হইতে টসটস করিয়া জল পড়িতেছে। গল্প বলা শেষ হইলে মোহনলাল বলিল 'এবার তোমার গল্প বলা ঠিক হয়েছে। এবার দাদামশায়কে শুনাতে পার।'

পরদিন অবনবাবুর দরবারে আসিয়া হাজির হইলাম।

এবার গল্পের আসরে পূর্বের মত তিনি সবাইকে আহ্বান করিলেন না। শুধু অবনবাবু আর তার দুই ভাই-সমর আর গগন। আর তার ছোট ঘোট নাতি-নাতনীরা। এবার আর পূর্ববারের মত গল্প বলিতে বলিতে ঠেকিয়া গেলাম না। আগাগোড়া গল্পটি সুন্দর করিয়া বলিয়া গেলাম। গল্প শেষ করিয়া নিজেরই ভাল লাগিল। ভাবিলাম অবনবাবু এবার আমার গল্পের তারিফ করিবেন। কিন্তু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়, আমার সেই কথিত গল্পটি তিনি একটু-আধটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমি যেখানে করুণরসের অবতারণা করিয়াছিলাম সেখানে হাস্যরস করিয়া এমন সুন্দর করিয়া গল্পটি বলিলেন যে তার কথিত গল্পটি একেবারে নূতন হইয়া গেল।

ফেরার পথে মোহনলাল বলিল, "এবার তোমার গল্প বলা ভাল হয়েছে। সেইজন্যই দাদামশায় ওটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমাকে শুনিয়ে দিলেন। ওটাই তোমার গল্প বলার পুরস্কার।"

আমি কিছু নকসী কথা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। একদিন অবনবাবু এই কথা শুনিয়া খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁর ড্রয়ার হইতে তিনি এক তাড়া কাগজ বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে নানান রঙের বহু কাঁথার নক্সা ঝলমল করিতেছে। কথা সেলাই করিতে

এক এক রকম নক্সায় এক এক রকমের ফোড়নের প্রয়োজন হয়। বয়কা সেলাই, বাঁশপাতা সেলাই, তেরসী সেলাই প্রভৃতি যত রকমের কথা-সেলাই প্রচলন আছে, তাহার প্রত্যেকটি নক্সা সেই কাগজগুলিতে আঁকা। নানা কথা সংগ্রহ করিয়া এই নক্সাগুলি তৈরী করিতে অবনবাবুর বহুদিন একান্ত তপস্যা করিতে হইয়াছে। আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম, আমাদের কত আগে তিনি এইসব অপূর্ব পল্লীসম্পদের সন্ধান করিয়াছিলেন।

নকসী কাঁথার প্রশংসা করিতে অবনবাবুর মুখ দিয়া যেন নকসী কথার ফুল ঝরিয়া পড়ে। রাণী ইসাবেলাকে কে যেন একখানা নকসী কাঁথা উপহার দিয়াছিলেন। মহাভারতে চামড়ার উপর নক্সা-করা এক রকমের কথার বর্ণনা আছে। সিলেট জেলার একটি বিধবা মেয়ে একখানি সুন্দর কথা তৈরী করিয়াছিলেন; তার জীবনের বালিকা বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের উৎসব, শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, নববধূর ঘরকন্না, প্রথম শিশুর জন্ম, স্বামীর মৃত্যু প্রভৃতি নানা ঘটনা তিনি এই কাঁথায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

দেশে ফিরিয়া সিলেট জেলার এই মহিলার কাহিনী বারবার আমার মনে উদয় হইত। আমার নকসী কাঁথার মাঠ' পুস্তকে আমি যে কাঁথার উপর এতটা জোর দিয়াছি, তাহা বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের-ই প্রভাবে।

আর একবার কলিকাতা আসিয়া 'নকসী কাঁথার মাঠ' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া অবনীন্দ্রনাথকে দেখাইলাম। ইতিপূর্বে দীনেশবাবু এই পাণ্ডুলিপির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। অবনবাবু ছবি আঁকিতে আঁকিতে আমাকে আদেশ করিলেন, "পড়।"



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আমি খাতা খুলিয়া নকসী কাঁথার মাঠ'-এর প্রথম পৃষ্ঠা হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। খানিক পরে দেখি, ও-পাশে সমরেন্দ্রনাথ তাঁহার বই পড়া রাখিয়া আমার কাব্য শুনিতেছেন। গগনবাবুর তুলিও আস্তে আস্তে চলিতেছে। আমি পড়িয়া যাইতিছি, বইএর কোন জায়গায় আধুনিক ধরনের কোন প্রকাশভঙ্গিমা আসিয়া পড়িলে অবনবাবু তাহা পরিবর্তন করিবার উপদেশ দিতেছেন। মাঝে মাঝে আমার হাত হইতে খাতাখানা লইয়া তারই স্বভাবসুলভ গদ্যছন্দে সমস্ত পৃষ্ঠাটি পরিবর্তন করিয়া দিতেছেন। আমি বাড়িতে আসিয়া রাত্রি জাগিয়া সেই পৃষ্ঠাগুলি আবার নূতন করিয়া লিখিয়া লইয়াছি। কারণ অবনবাবুর সমস্ত নির্দেশ গ্রহণ করিলে তাহার ও আমার রচনায় মিলিয়া বইখানা একটি অদ্ভুত ধরনের হইত।

সকালে আসিয়া আমি কবিতা শুনাইতে বসিতাম। বেলা একটা বাজিয়া যাইত, চাকর আসিয়া তাহাকে স্নানের জন্য লইয়া যাইত। আমিও বাসায় ফিরিতাম। এইভাবে চার-পাঁচ দিনে বই পড়া শেষ হইল। বলা বাহুল্য যে এতটুকু বই পড়িয়া শুনাইতে এত সময় লাগিবার কথা নয়। কিন্তু বইয়ের কোন কোন জায়গায় পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে অবনবাবু অনেক সময় লইতেন।

এই কয়দিন তিনি শুধু আমার বই পড়াই শোনেন নাই, তাঁর হাতের তুলিও সামনের কাগজের উপরে রঙের উপর রঙ মেলিয়া নানা ছবির ইন্দ্রধনু তৈরী করিয়াছে। দীনেশবাবু এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া এত প্রশংসা করিলেন, অবনবাবুর কাছেও সেই ধরনের প্রশংসা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু অবনবাবু শুধু বলিলেন, "মন্দ হয় নাই। ছাপতে দাও।"

গগনবাবু কোন কথা বলিলেন না। শুধু সমরবাবু এক দিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমার কবিতাটি বড়ই ভাল লাগল। নজরুলের চাইতেও ভাল লাগল।”

অবনবাবুর সংশোধন-করা নকসী কাঁথার মাঠের পাণ্ডুলিপি বন্ধুবর মোহনলালের নিকট আছে।

‘নকসী কাঁথার মাঠ’ ছবি সহ প্রকাশ করিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয়-লিপিতে বন্ধুবর রমেন্দ্র চক্রবর্তী এই পুস্তকের ছবিগুলি আঁকিয়া দিতে রাজী হইলেন। কিন্তু আমি লিখিয়াছি পূর্ববঙ্গের কথা। রমেন্দ্র কোন দিন পূর্ববঙ্গ দেখেন নাই। পূর্ববঙ্গের মাঠ আঁকিতে তিনি শান্তিনিকেতনের মাঠ আঁকেন। আমাদের এখানে মেয়েরা কলসী কাখে করিয়া জল আনিতে যায়, ও-দেশের মেয়েরা কলসী মাথায় করিয়া জল আনে। আমাদের দেশে কথা সামনে মেলন কবিয়া ধরিয়া তার উপরে বসিয়া মেয়ের কথা সেলাই করে। রমেন্দ্র ছবি আঁকিলেন, একটি মেয়ে কাঁথাটি কোলের উপর মেলিয়া সেলাই করিতেছে। ছবিগুলি দেখিয়া আমার বড়ই মন খারাপ হইল। তাছাড়া তখন পর্যন্ত আমার কোন লেখাকে ছবিতে প্রতিফলিত হইতে দেখি নাই। তখনকার কবি-মন কবিতায় যাহা লিখিয়াছে, মনে মনে ভাবিয়াছে তার চাইতেও অনেক কিছু। সেই অলিখিত কল্পনাকে রূপ দিবেন শিল্পী। কিন্তু এরূপ শিল্পী কোথায় পাওয়া যাইবে? এখন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এখন কোন কবিতা কেহ চিত্রিত করিলে চিত্রকরকে অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়া তবে তার বিচার করি।

ছবিগুলি আনিয়া অবনবাবুকে দেখাইলাম। বলিলাম, আমার বইএর সঙ্গে ছবিগুলি মেলে না। তিনি কিছুক্ষণ ছবিগুলি দেখিয়া বলিলেন, "তোমার কবিতা অন্য ধরনের। আমি ছাড়া এর ছবি আর কেউ আঁকতে পারবে না।"

আমি বোকা। তখন যদি বলিতাম, আপনি ছবি আঁকার ভার নেন, হয়ত তিনি রাজি হইয়া যাইতেন। কিন্তু আমি বলিলাম, "ছবিগুলি আমার পছন্দ হচ্ছে না। রমেন্দ্রবাবুকে এই কথা কী করে বলি?"

অবনবাবু উত্তর করিলেন, "রমেনকে বল গিয়ে আমার নাম করে। বলো যে ছবিগুলি আমি পছন্দ করি নি।"

বন্ধুবর ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইয়েব ছবিগুলি অকিয়া দিবেন, কথা দিয়াছিলেন। কয়েকটি ছবি তিনি আঁকিয়াও ছিলেন। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হইলেন না।

গগনবাবুকে একদিন এইকথা বলিলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার বইয়ের ছবি আমি করে দেব।" কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই গগনবাবু রোগে আক্রান্ত হইলেন। এবং এই রোগেই তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। গগনবাবুর মত এমন সুন্দর প্রাণ গুণীলোক দেখি নাই। তাঁর মত গুণের আদর কেহ করে নাই। আমার ওস্তাদ দীনেশবাবুর মুখে শুনিয়াছি, গগনবাবু যদি কাউকে পছন্দ করিতেন, তাকে সর্বস্ব দান করিতে পারিলে খুশি হইতেন। দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তক পড়িয়া তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই জন্য তিনি বিশ্বকোষ লেনে

দীনেশবাবুকে একখানা বাড়ি তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার বুকে কাউকে একখানা বাড়ি তৈরী করিয়া দেওয়া কতটা ব্যয়সাপেক্ষ তাহা সহজেই বোঝা যায়।

কিছুতেই ছবি দিয়া 'নকসী কাঁথার মাঠ' প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। অবনবাবু উপদেশ দিলেন, তোমার পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বে কয়েক লাইন করিয়া গ্রাম্য কবিদের রচনা জুড়িয়া দাও। তাহারাই ছবির মত তোমার বইকে চিত্রিত করিবে। অবনীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারেই নকসী কাঁথার মাঠ' পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্বে নানা গ্রাম হইতে আমার সংগৃহীত গ্রাম্য-গানগুলির অংশবিশেষ জুড়িয়া দিলাম। গানের পিছনে তার-যন্ত্রের ঐক্যতানের মত তাহারা আমার পুস্তকের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বর্ণিত ভাবধারাকে আরও জীবন্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে। অবনবাবু 'নকসী কাঁথার মাঠ' পুস্তকের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। প্রচ্ছদপটের জন্য তিনি একটি ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলেন। পানির উপরে একখানা মাঠ ভাসিতেছে। সেই ছবিতে খুব সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম তুলি ধরিয়া তিনি এমন ভাসা-ভাসা আবছায়া রঙের মাধুরী বিস্তার করিয়াছেন, আমার প্রকাশক হরিদাসবাবু বলিলেন, ব্লক করিলে এ ছবির কিছুই থাকিবে না। সুতরাং ছবিখানি ব্যবহার করা গেল না। অমূল্য সম্পদের মত আমি উহা সঙ্গে রক্ষা করিতেছি।

'নকসী কাঁথার মাঠ' ছাপা হইবার সময় মাঝে মাঝে অবনবাবু তাহার প্রুফ ও দেখিয়া দিয়াছিলেন। দীনেশবাবুও ইহার অনেক গুলি প্রুফ দেখিয়া দিয়াছিলেন। আজ এ কথা বলিতে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। কত ক্ষুদ্র কাজের জন্য কষ্ট বড় দুটি মহৎ লোকের সময়ের অপব্যয় করাইয়াছি। আমি যখনই কলিকাতায় যাইতাম, প্রতিদিন সকালে গিয়া অবনবাবুর সামনে বসিয়া থাকিতাম। তিনি আরামকেদারায় বসিয়া ছবির উপরে রঙ

লাগাইতে থাকিতেন। মাঝে মাঝে সেই ছবিকে পানির মধ্যে ডুবাইয়া ধুইয়া ফেলিতেন; আবার তাহা শুখাইয়া তাহার উপরে নিপুণ তুলিকায় রঙের উপরে রঙ লাগাইয়া যাইতেন। ও-পাশে গগনবাবুও তাহাই করিতেন। আমি বসিয়া বসিয়া এই দুই বয়স্ক শিশুর রঙের খেলা দেখিতাম। ছবি আঁকিতে আঁকিতে অবনবাবু আমাকে গ্রাম্য গান গাহিতে বলিতেন। আমি ধীরে ধীরে গান গাহিয়া যাইতাম। বাড়ির ছেলেমেয়েরা আড়াল হইতে আমার গান শুনিয়া মুচকি হাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু আমার বয়স্ক শ্রোতাদের কোন দিনই অবহেলা লক্ষ্য করি নাই। নতুন কোন গ্রাম্য কাহিনী সংগ্রহ করিলে তাহাও অবন বাবুকে শুনাইতে হইত। নতুন কোন লেখা লিখিয়া আনিলে তিনি ত শুনিতেনই। সেইসব লেখা শুনিয়া তাহার কোথায় কোথায় দোষত্রুটি হইয়াছে, তাহাও বলিয়া দিতেন। কোন লেখারই কখনও তারিফ করিতেন না। কোন লেখা খারাপ লাগিলে তিনি আমাকে বলিতেন। লেখার ভিতরে ইঙ্গিত থাকিবে বেশি; সব কথা খুলিয়া বলিবে; কলম টানিয়া লইবার সংযম শিক্ষা কর।

০৩.

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার লেখাগুলি শুনিয়া অবন বাবুর ছবি আঁকার কাজের ব্যাঘাত হইত না। বরঞ্চ আমার মত কেহ তার কাছে বসিয়া গল্প করিলে ছবি আঁকা আরও সুন্দর হইত। এইজন্য বাড়ির লোকে আমার ঘন ঘন তার কাছে যাওয়া-আসা খুব পছন্দ করিতেন।

একদিন মোহনলালের বাবা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন, “অবনবাবু তোমার ‘নকসী কাঁথার মাঠ’এর কথা বললেন। তোমার বই তার ভাল লেগেছে। আমাকে আদেশ করলেন বইএর ছন্দের বিষয়ে তোমাকে নির্দেশ দিতে। তা ছন্দের রাজা অবনবাবুই যখন তোমার সমস্ত বই দেখে দিয়েছেন, আমার আর কি প্রয়োজন।” আমি বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইলাম। আমার সামনে না করিলেও অগোচরে তিনি পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন।

বার বার অবনবার বাড়ি আসিয়া তাহার দৌহিত্র মোহনলালের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে এমন নিরহঙ্কার মিশুক লোক খুব কমই দেখিয়াছি। মোহনলালের বন্ধুগগাষ্ঠী এমনই বিচিত্র, এবং পরস্পরে এমন আকাশ-জমীন তফাৎ, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

আমি যখন কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিতাম তখন মোহনলালের সঙ্গে সুদীর্ঘ পত্রালাপের মাধ্যমেঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিতির যোগসূত্র বজায় রাখিতাম। আমি লিখিতাম পল্লীবাংলার গ্রামদেশের অলিখিত রুপকাহিনী। বর্ষাকালে কোন ঘন বেতের ঝাড়ের আড়ালে ডাহুকের ডাক শুনিয়াছি, কোথায় কোন ডোবায় সোলপোনাগুলি জলের উপরে আলপনা আঁকিতে আঁকিতে চলিয়াছে, বসন্তের কোন মাসে কোন বনের মধ্যে নতুন গাছের পাতার ঝালর দুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরে আমগাছের শাখায় হলদে-পাখিটি ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হইতেছে, এই সব কাহিনী। আর মোহনলাল লিখিত তার দাদামশায়ের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনা; আমার মানসলোকের রবীন্দ্রনাথের রহস্যময় আনাগোনার কথা, কোন মাসে তিনি শান্তি নিকেতনের রূপকারদের সঙ্গে লইয়া আসিয়া কোন কথাকাহিনীর উপহার দিয়া গেলেন কলিকাতার

বুকে—সেই সব ঘটনা। চিঠির ঘুড়িতে চড়িয়া তখন দেবলোকের ইন্দ্রজিতের মনের গগন-কোণে আসিয়া ভিড় জমাইত। চিঠিতে যে কথা সবটা স্পষ্ট হইয়া না উঠিত, কলিকাতা গিয়া বন্ধুর সঙ্গে একান্তে বসিয়া সেই সব কথা ইনাইয়াবিনাইয়া ওলট করিয়া পালট করিয়া নতুন ভাবে উপভোগ করিতাম।

তারপর অবনঠাকুরের বারান্দায় দিনের পর দিন, সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত, একাগ্র বসিয়া থাকিতাম। দুই ভাই অবনবাবু আর গগনবাবু রঙের জাদুকর; কথার সরিৎসাগর। তুলির গায়ে রঙ মাখাইয়া কাগজের উপরে রঙ মাখামাখি খেলা—দেখিয়া দেখিয়া সাধ মেটে না। দূর-অতীতে মোগল-হেরেমের নির্জন মণিকোঠায় সুন্দরী নারীর অধরের কোণে যে ক্ষীণ হাসিটি ফুটিতে না ফুটিতে ওড়নার আড়ালে মিলাইয়া যায়—একজন তারই এতটুকু রেস রঙিন তুলির উপরে ধরিয়া বিশ্বের রূপপিয়াসীদের মনে অনন্তকালের সান্ত্বনা আঁকিয়া দিতেছেন, আরজন কথাসরিৎসাগরে সাঁতার কাটিয়া ইন্দ্রধনুর দেশ হইতে রূপকথার রূপ আনিয়া কাগজের উপরে সাজাইতেছেন। এ রূপ দেখিয়া মন তৃপ্তি মানে না। দিনেয় পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, সকাল হইতে দুপুর, বিকাল হইতে সন্ধ্যা চলিয়াছে দুই জাদুকরের একান্ত সাধনা। এদের বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, প্রতিবেশী নাই। নীড়হীন দুই চলমান বিহঙ্গ উড়িয়া চলিতে চলিতে পথে পথে ছবির রঙিন ফানুস ছড়াইয়া চলিয়াছেন। এরা চলিয়া যাইবেন আমাদের গ্রহপথ হইতে হয়ত আর কোন সুন্দরতর গ্রহপথে। যাওয়ার পথখানি ছবির রঙিন আখরের দান-পত্রে রাঙাইয়া চলিয়াছেন। দুইজনের মুখের দিকে একান্তে চাহিয়া থাকি। গগনবাবু কথা বলেন না মাঝে মাঝে মৃদু হাসেন। সে কী মধুর হাসি! অবনবাবু কাগজের উপর রঙ চড়ান, আর মধ্যে মধ্যে কথা বলেন। কথার সরিৎসাগরে অমৃতের লহরী খেলে।

অবনবাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন, “কি হে, জসীমিঞা, কোন কথা যে বলছ না?”

কথা আর কী বলিব। হৃদয় যেখানে শ্রদ্ধা হইয়া ওই দুই সাধকের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছে, সেখানে সকল কথা নীরব। মনে মনে শুধু বলি অমনই একান্ত সাধনার শক্তি যেন আমার হয়। আমার যা বলার আছে, তা যেন একান্ত তপস্যায় অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে।

০৪.

অতি সঙ্কোচের সঙ্গে একদিন জিজ্ঞাসা করি, “দাদামশাই, (মোহনলালের সঙ্গে আমিও তাকে দাদামশাই বলিয়া ডাকিবার অধিকার পাইলাম) আপনি ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর জন্মদাতা। আপনার মুখে একবার ভাল করে শুনি ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে।”

ছবিতে রং লাগাইতে লাগাইতে অবনবাবু বলেন, “আমি জানিনে বাপু, ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে।”

আমি বলি, “তবে যে ওরিয়েন্টাল আর্ট নিয়ে লোকের এত লেখালেখি। সবাই বলে, অপনি ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর পথের দিশারী।”

হাসিয়া অবনবাবু বলেন, “তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে, ওরিয়েন্টাল আর্ট কাকে বলে। আমি করেছি আমার আর্ট। আমি যা সুন্দর বলে জেনেছি, তা আমার মত করে এঁকেছি। কেউ যদি আমার মত করে আঁকতে চেষ্টা করে থাকে, তারা আমার অনুকরণ করেছে। তারা তাদের আর্ট করতে পারেনি।”

নিজের ছবির বিষয়ে তার কি মত, জানিতে কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার ছবির পাত্র-পাত্রীদের আপনি সুন্দর করে আঁকেন না কেন? লোকে বলে আপনি ইচ্ছে করেই আপনার চরিত্রগুলোকে এবড়ো-খেবড়ো করে আঁকেন।”

অবনবাবু বলেন, “আমি সুন্দর করেই আঁকি। আমার কাছে আমার সুন্দর। তোমাদের কাছে তোমাদের সুন্দর। আমি ইচ্ছে করে কোন ছবি অসুন্দর করে আঁকিনে।”

আমি তবু বলি,“আপনার বনবানীর ছবিখানার কথাই ধরা যাক। অত বয়সের করে এঁকেছেন কেন? অল্প বয়সের করলে কি দোষ হত?”

অবনবাবু হাসেন : “আমি ওই বয়সেই তাকে সুন্দর করে দেখেছি।”

এখন নিজের ভুল বুঝিতে পারি। বন কত কালের পুরাতন; সেই বনের রানীও অমনি পুরাতন বয়সের হইবেন। তাছাড়া অবনবাবুর বয়সও সেই বনের মত প্রবীন।

আর একদিন অবনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “দাদামশাই, কিছু লিখতে মন আসছে না। কি করি?”

তিনি বলিলেন, “চুপ করে বসে থাক। পড়াশুনো কর।”

আমি জিজ্ঞাসাকরি, “আচ্ছা দাদামশাই, মনের ভাবকে বাড়াবার জন্য আপনি কিছু করেন না?”

দাদামশাই হাসেন : "আমার যা ভাব আছে, তারই জন্যে রাতে ঘুম হয়না। সারাদিন তাই ভাব কমানোর জন্য ছবি আঁকি। আর ভাব বাড়ালে ত মরে যাব।"

অবন আর গগন দু-ভাই আঁকেন। ওপাশে সমর বসিয়া বসিয়া শুধু বই পড়েন। কত দেশী-বিদেশী গুণীব্যক্তিরা আসেন। অবনের কাছে আর গগনের কাছে তাদের ভিড়। সমরের দিকে তাঁরা ফিরিয়াও চাহেন না। সময় তাঁর বই-এর পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলেন। আরব্য রজনীর ইংরাজী অনুবাদ, কালীসিংহের মহাভারত, কুট হ্যামসুন, টলস্টয় ইত্যাদি কত দেশের কত মহামনীষীর লেখা। স্বপনপুরীর রাজপুত্র বই-এর পাতায় ময়ুরপঙ্খীতে চড়িয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মাঝে মাঝে বই হইতে মুখ তুলিয়া গগনের ছবি দেখেন—অবনের ছবি দেখেন। দুই ভাই-এর সৃষ্টির গৌরব যেন তাঁরই একার। এই রঙ-রেখার জাদুকরদের দ্বারপ্রান্তে তিনি যেন প্রহরীর মত বসিয়া আছেন। কতবার কত সময়ে আমি সেই বারান্দায় গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছি। কোনদিন ভাই-এ ভাই এ কথা-বলাবলি করিতে শুনি নাই। ঝগড়া ত তাহারা জানিতেনই না; সাংসারিক কোন আলাপ, কি কোন অবসর বিনোদনের কথাবার্তা—কোন কিছুতেই এই তিন ভাইকে কোনদিন মশগুল দেখিতে পাই নাই। গগন খুশি আছেন, এপাশে অবন ছবি আঁকিতেছেন ওপাশে সমর বই পড়িতেছেন। অবন খুশি আছেন,- পাশে গগনের তুলিকাটা কাগজের উপর উড়িয়া চলিয়াছে তেপান্তরের রূপকথার দেশে। সমর ত দুই ভাই এর সৃষ্টি কার্যের গৌরবে ডগমগ। কথা যদি এদের কিছু থাকে, সে কথা হয় মনে মনে। পাশে ভাইরা বসিয়া আছেন, ইহাই ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আনন্দ।

এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় অবন নামিয়া আসেন নিচের তলায় হলঘরে। সেখানে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের নাতিপুতিরা অবনদাকে ঘিরিয়া ধরে, "গল্প বল।"

অবনের গল্প বলার সে কী ধরন। অবন যেমন ছবি আঁকেন, রঙ দিয়া মনের কথাকে চক্ষুর গোচর করাইয়া দেন—তেমনি তার গল্পের কাহিনীকে হাত নাড়িয়া ইচ্ছামত চোখমুখ ঘুরাইয়া কোনখানে কথাকে অস্বাভাবিকভাবে টানিয়া কোন কথাকে দ্রুতলয়ে সারিয়া তার গল্পের বিষয়বস্তুকে চক্ষুগোচর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে ইকিড়ি-মিকিড়ি কথা ভরিয়া শব্দের অর্থের সাহায্যে নয়, ধ্বনির সাহায্যে গল্পের কথাকে রূপায়িত করেন।

অবনের দুই অস্ত্র-রঙ আর কথা, আঁচড় আর আখর। তাঁকে ঘিরিয়া শিশুলের মৌমাছি সর্বদা গুনগুন করে।

কোন কোন দিন তিনি ভূতের গল্প বলিয়া শিশুদের ভয় পাওয়াইয়া দেন। বলেন, ভূতের গল্প শুনিয়া ওদের হার্ট বলবান হইবে।

সেদিন ছিল বর্ষা। অবন নিচে নামিয়া আসিলেন। বাড়ির সকলে তাকে ঘিরিয়া বসিল। ভাইপোরা নাতি-নাতনীরা সকলে। তিনি উদ্ভট ধাঁধা রচনা করিয়া সবাইকে তার মানে জিজ্ঞাসা করেন। নাতিনাতনীরা শুধু নয়, বয়স্ক ভাইপোরা পর্যন্ত সেই ধাঁধার উত্তর দিতে ঘামিয়ে অস্থির। কত রকমের ধাঁধা রচনা করেন! ধাঁধার কথাটি মুখে উচ্চারণ না করিয়া হাত নাড়িয়া চোখমুখ ঘুরাইয়া ধাঁধার ছবি তৈরী করেন, সঠিক উত্তর না পাইলে উত্তরটিকে আরও একটু ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। নাতিপুতিরা উত্তর দিলে খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠেন।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটির পর দেশ হইতে ফিরিয়া মোহনলালের কাছে শুনিলাম, খেয়াল হইয়াছিল কয়টি মোরগ পুষিবেন। সকালবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাতিপুতিদের লইয়া জল্পনাকল্পনা চলে, কি রকম মোরগ হইবে, কেমন তার গায়ের রঙ, কেমন তার চলনবলন। তারপর গাড়িতে করিয়া দুপুরের রোদে শেয়লদার হাট। এমনি তিন-চার হাট ঘুরিলেন। মনের মত মোরগ পাওয়া গেল না।

আমার কাছে ছিল একখানা শহীদে-কারবালার পুঁথি। তাকে পড়িতে দিলাম। সে বই তিনি শুধু পড়িলেন না, যে জায়গা তার ভাল লাগিল দাগ দিয়া রাখিলেন। হাতের চিহ্ন-আঁকা সেই বই এখনো আমার কাছে আছে।

তারপর খেয়াল চাপিল, আরও পুঁথি পড়িবেন। আমাকে বলিলেন, "ওহে জসীমিঞা, চল তোমাদের মুসলমানী পুঁথির দোকানে মেছুয়াবাজারে।"

তাঁকে লইয়া গেলাম কোরবান আলী সাহেবের পুঁথির দোকানে। দোকানের সামনে অবনীন্দ্রনাথের গাড়ি। জোব্বাপাজামা পরা এ কোন শাহজাদা পুঁথির দোকানে আসিয়া বসিলেন। পুঁথিওয়ালার অবাক! এমন সুন্দর শাহজাদা কোন দিন তাদের পুঁথির দোকানে আসে নাই। এটা-ওটা পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করেন। দোকানী আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করেন, "কে ছদ্মবেশী বাদশাজাদা?" আমি বলি, "বাদশাজাদা নন, ইনি রঙের রেখার আর কথার আতসবাজ, পাশ্চাত্ত্য ও দেশীয় চিত্রকলার শাহানশাহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

দোকানী ব্যস্ত হইয়া ওঠে মেছুয়াবাজারের মালাই-দেওয়া সিঙ্গল চা ও পান আনিয়া হাজির করে।

দোকানীর কানে কানে বলি, "ওসব উনি খাবেন না। পেয়ালাগুলো দেখুন না কেমন ময়লা?

দোকানীর আন্ত িতা দেখিয়া চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়া বলিলেন, "দেখ জসীমিঞা, কেমন সুন্দর চা।"

দোকানী খুশি হইয়া যেখানে যত ভাল পুঁথি আছে, তার সামনে আনিয়া জড় করে। ছহি সোনাভান, জয়গুন বিবির কেচ্ছা, আলেফ লায়লা, গাজী কালু চম্পাবতী—আরও কত বই। শিশু যেমন মুড়ি কুড়াইয়া খুশি হইয়া বাড়িতে লইয়া আসে, তেমনি এক তাড়া বই কিনিয়া অবনীন্দ্রনাথ ঘরে ফিরিলেন। তারপর দিনের পর দিন চলিল পুঁথি পড়া। শুধু পড়া নয়—পুঁথির যেখানে নায়িকার বর্ণনা, গ্রামদেশের প্রকৃতির বর্ণনা, বিরহিনী নায়িকার বারোমাসের কাহিনী, অবনবাবু তার খাতার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখেন। খাতার পর খাতা ভর্তি হইয়া যায়। সবগুলি পুধি শেষ হইলে আবার একদিন চলিলেন সেই মেছুয়াবাজারে। এমনি করিয়া বার বার গিয়া এ-দোকান ও-দোকান ঘুরিয়া শুধু পুঁথিই কিনিলেন না, পুঁথির দোকানদারদের সঙ্গে রীতিমত বন্ধুত্ব করিয়া আসিলেন।

০৫.

রোজ সকাল হইতে দুপুর, আবার বিকাল হইতে সন্ধ্যা সামনে পুঁথি পড়া চলিয়াছে। খাতার পর খাতা ভর্তি হইয়া চলিয়াছে। কেহ দেখা করিতে আসিলে তাকে পুঁথি পড়িয়া শোনন—গাজীকালুর পুঁথিতে যেখানে বাঘের বর্ণনা, মামুদ হানিফের সঙ্গে সোনাভানের লড়াই-এর বর্ণনা, নানা গ্রামের নাম ও নায়ক-নায়িকার পোশাকের বর্ণনা। রঙ-গোলার কোটা শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। তুলিতে ধূলি জমিয়াছে। কোথায় রঙ, কোথায় কাগজ কোনদিকে খেয়াল নাই। এই রূপে তিন-চার মাস কাটিয়া গেল। আর বই পাওয়া যাইতেছে না। মজার গল্পে-ভরা যত পুথি, সব পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময় রবীন্দ্রনাথ আসিলেন শান্তিনিকেতন হইতে। খুড়োভাইপোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুসলমানী পুঁথি লইয়া আলাপ চলিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, পুঁথির একটি সংকলন বিশ্বভারতী হইতে ছাপাইবেন। পুঁথি-সংকলনের খাতা বিশ্বভারতীতে চলিয়া গেল। (সেগুলি হয়ত সেখানেই পড়িয়া আছে; আজও ছাপা হয় নাই।)

অবনীন্দ্রনাথ আবার ছবি আঁকায় মন দিলেন। কোথায় রঙের কৌটা শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে পানি ঢালিলেন, ধূলিমাখা তুলিটি ঝাড়িয়া মুছিয়া লইলেন।

একবার তাঁর খেয়াল চাপিল, মানুষের ছবি আঁকিবেন। বাড়ির সবাইকে ডাকিলেন সিটিং দিতে। অনেকের ছবি আঁকা হইয়া গেল। একদিন আমাকে বলিলেন, "এসো, তোমার একটি ছবি আঁকি।"

আমি সঙ্কোচবোধ করিতেছি। পাশে ব্বতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সিটিং দিতে বসিয়া গেলেন। আজ মনে বড়ই অনুতাপ হইতেছে। সেদিন যদি সঙ্কোচ না

করিতাম, তবে সেই অমর তুলিকার জাদুস্পর্শে নিজেকে কতকটা অমর করিয়া লইতে পারিতাম।

মহাত্মা গান্ধী যেদিন ডাণ্ডী-যাত্রা করিলেন লবণ-আইন অমান্য করিতে, তিনি সেইদিন আরব্য রজনীর ছবিগুলি আঁকা আরম্ভ করিলেন। এক একখানা ছবি আঁকিতে বিশ-পঁচিশ দিন লাগে। আমি সামনে বসিয়া বসিয়া দেখি আর তার কাছে আমার পল্লীবাংলার গল্প বলি।

কোথায় কোন গ্রামে এক বেদে সাপ ধরিতে যাইয়া সাপের ছোবলে মৃত প্রায় হইয়াছিল, তারপর বেদেনী আসিয়া কেমন করিয়া তাকে মন্ত্র পড়িয়া সারাইয়া দিয়াছিল; কোন গ্রামে ভীষণ মারামারি হইতেছিল, হঠাৎ আফাজদ্দি বয়াতি আসিয়া গান গাহিয়া সেই কলহপ্রবণ দুই দলকে মন্ত্র-যুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল; কোন গ্রামে মেয়েরা পিঠার উপর নক্সা আঁকিতে আঁকিতে গান করে, কোথায় এক বৈষ্ণবী গান গাহিতে থাকে আর তার বৈষ্ণব কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়ে; কোথায় কোন জঙ্গলে একটা বৃষকাষ্ঠ আছে, তার ছবিগুলি যেন জীবন্ত হইয়া কথা কহিতে চায়। আমি বলি এই সব কথা, আর তিনি ছবি আঁকিয়া চলেন।

বুড়া হইয়া যাইতেছেন। মুখের চামড়া ঝুলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তিনি বলেন, “সমস্ত আরব্য রজনীর গল্প ছবিতে ছবিতে ভরে দেব।”

আমি জিজ্ঞাসা করি, “দাদামশাই, এক একটা ছবি আঁকতে এতদিন সময় নিচ্ছেন, এতবড় বিরাট আরব্য রজনীর বই-এর ছবিগুলি কি আপনি শেষ করে যেতে পারবেন?

দাদামশাই হাসিয়া উত্তর করেন, "আমি শিল্পীর কাছে শিল্প সীমাবদ্ধ, কিন্তু শিল্পীর জীবন—eternal অনন্ত। এর কোন শেষ নেই, কতদিন বেঁচে থাকব সে প্রশ্ন আমার নয়, আমায় কাজ করে যেতে হবে।"

দিনের পর দিন ছবি আঁকা চলিল। তখন বাংলার রাজনৈতিক আকাশে অসহযোগের ডামাডোল চলিতেছে। মহাত্মা গান্ধী জেলে গেলেন। সমস্ত ভারত রাজনৈতিক চেতনায় উন্মাদ হইয়া উঠিল। খবরের কাগজে নিত্য নূতন উত্তেজনাপূর্ণ খবর বাহির হইতেছে। ইস্কুল-কলেজ ভাঙিতেছে, জেলে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার হইতেছে, কিন্তু শিল্পী একান্তে বসিয়া বসিয়া আরব্য রজনীর ছবি আঁকিতেছেন। কোনদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টাইয়া দেখেন না। সকাল হইতে দুপুর, আবার বিকাল হইতে সন্ধ্যা-সমানে চলিয়াছে ছবি আঁকার সাধনা। সেই ছবিগুলিতে শিল্পীর বাড়িরই ছেলেমেয়েরা, তারাই যেন আরব্য রজনীর পোশাক পরিয়া নাটক করিতে নামিয়াছে। এমনি করিয়া প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ আসিলেন বসন্ত-উৎসবের নাচের দল লইয়া। অবনীন্দ্রনাথ চলিলেন এম্পায়ার থিয়েটার-হলে অভিনয় দেখিতে।

পরদিন সকালে দেখি, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ওহে জসীমিঞা, কাল শান্তিনিকেতনের বসন্ত-উৎসব দেখে এলাম। ওরা কী আবিরের গুড়ো ছড়িয়ে দিল। তাতে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তোমাদের মোগলযুগের ছবি আর চোখে দেখতে পাচ্ছিনে।"

সেইদিন হইতে তার আরব্য রজনীর ছবি আঁকা শেষ হইল। সেই অসমাপ্ত ছবিগুলি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।

বি. এ. পাশ করিয়া এম. এ. পড়িতে আমি কলিকাতায় আসিলাম। তখন থাকিতাম মেছুয়াবাজার ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে। কিন্তু আমার মন পড়িয়া থাকিত অবনঠাকুরের দরবারে। অবসর পাইলেই আমি অবনীন্দ্রনাথের সামনে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। তিনি ধীরে ধীরে ছবির উপরে তুলি চালাইয়া যাইতেন। একটি বাঁশের চোঙায় তার ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম রাখিতেন।

তিনি ছবির উপরে খুব আবছা রঙ দেওয়া পছন্দ করিতেন। একখানা কাঠের তক্তার উপর কাগজ রাখিয়া তিনি ছবি আঁকিতেন। হাতের তুলিটি যেন ইচ্ছামত নরম হইত, ইচ্ছামত শক্ত হইত। এ-রঙে ও-রঙে তুলি ঘষিয়া তিনি মাঝে মাঝে সামান্য জল মিশাইয়া ছবির উপরে মৃদু প্রলেপ মাখাইয়া যাইতেন। প্রথমে কাগজের উপর তিনি শুধু রঙ পরাইয়া যাইতেন। সেই রঙের উপর ধীরে ধীরে ছবির মূর্তিগুলি ভাসিয়া উঠিত। আমার মনে হইত, কোন ইন্দ্রপুরীর জাদুকর নিজের ইচ্ছামত কাগজের উপর রঙের কয়েকটি রেখার বন্ধনে স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলের দেব-নর-যক্ষ-কিন্নরদের আনিয়া ইচ্ছামত অভিনয় করাইয়া যাইতেছেন। সেই অভিনয়ের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত দেখিতে প্রতিদিন কে যেন আমাকে সেখানে টানিয়া লইয়া যাইত। মাঝে মাঝে তিনি তার অঙ্কিত ছবির কাগজখানি পানিতে ডুবাইয়া লইতেন। রঙ আরও ফ্যাকাশে হইয়া যাইত। কাগজ কিঞ্চিৎ শুকাইলে আবার তাহার উপরে তিনি নতুন করিয়া রঙ পরাইতেন। এ দৃশ্য দেখিতে আমার বড়ই ভাল লাগিত।

০৬.

অবনীন্দ্রনাথের স্ত্রী ছিলেন সাদাসিধে রকমের ভালমানুষটি। গল্প করিতে খুব ভালবাসিতেন। মোহনলাল তাকে দাদু বলিয়া ডাকিত। সেই সঙ্গে আমিও তাকে দাদু বলিতাম। তিনি রেডিও শুনিতে খুব পছন্দ করিতেন। আমি মাঝে মাঝে রেডিও সম্পর্কে গল্প বলিয়া তাকে খুশি করিতাম। তাঁর ঘরে গিয়া রেডিও শুনিতে চাহিলে তিনি যেন হাতে-স্বর্গ পাইতেন। অতবড় বাড়িতে সবাই আর্ট-কালচার লইয়া বড় বড় চিন্তাধারা লইয়া মশগুল থাকিত। স্বামীর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি কত বিরাট কত বিস্তৃত। তিনি সেখানে হয়ত হারাইয়া যাইতেন। তাই তাঁর ক্ষুদ্র রেডিও-যন্ত্রটি বাজাইয়া নিজের স্বল্পপরিসর একটি জগৎ তৈরী করিয়া লইতেন।

সন্ধ্যা হইলে অবনীন্দ্রনাথ ঘরে আসিয়া বসিতেন। কখনও খবরের-কাগজ পড়িতেন না। তিনি বলিতেন, "খবর শুনতে হয়। পড়ার জন্য ত ভাল ভাল বই আছে।"

তাঁর আদরের চাকর ক্ষিতীশ। সন্ধ্যার পরে তার পায়ে তৈল মালিশ করিত আর নানা রকম সত্য-মিথ্যা গল্প বলিয়া যাইত। কোন পাড়ায় একটা মাতাল ঢুকিয়া পড়িয়া কী সব কাণ্ড-বেকাণ্ড করিয়াছিল; কোথায় কংগ্রেসসেবকের উপর গোরা সৈন্যেরা গুলি চালাইয়াছিল, কী করিয়া একজন সাধু আসিয়া সেই বন্দুকের গুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল; গান্ধী সৈন্যের কোন কোন দেশ জয় করিয়া কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে—এই সব আজগুবি কাহিনী। রূপকথার শিশু-শ্রোতার মত শিল্পী এই সব খবর শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন।

কোন কোন দিন গৃহিণীর রেডিও-যন্ত্রটি কোন অনুষ্ঠানের চটকদার সুর লইয়া জোরে বাজিয়া উঠিয়া গল্প শোনার কাজে ব্যাঘাত ঘটাইলে অতি-মৃদুস্বরে তিনি বলিতেন, "বলি, তোমার যন্ত্রটি একটু থামাও না।" গৃহিণী লজ্জিত হইয়া রেডিওর শব্দ কমাইয়া দিতেন।

শুনিয়াছি, রেডিও-যন্ত্রটি লইয়া মাঝে মাঝে গৃহিণীর সঙ্গে তার মত-বিরোধ হইত। স্বামী যে একটা মহান সৃষ্টিকার্যে নিমগ্ন, সেটা তিনি বুঝিতেন। নানা রকমের সেবা লইয়া পূজার হস্ত প্রসারিত করিয়া এই নরদেবতাকে তিনি তাঁর ক্ষুদ্রপরিসর মনের আকুতি দিয়া সর্বদা অর্চনা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন।

জমিদারীর আয় কমিয়া যাইতেছে। আদরের চাকর রাধু বিবাহ করিতে বাড়ি যাইবে। তাকে কিছু টাকা দেওয়ার প্রয়োজন। আগেকার দিনে এসব ব্যাপারে তিনি কতবার হাজার টাকার ছোড়া ফেলিয়া দিয়াছেন। এখন আর সে দিন নাই। তবু কিছু দিতে হইবে। কিন্তু হাতে উঠাইয়া কিছু দিতে গেলে বড় ছেলে হয়ত অসন্তুষ্ট হইবে। তিনি রাধুর একটা ছবি আঁকিলেন—সে যেন পুকুরের ধারে* ছিপ হাতে মাছ ধরিতেছে। একজিবিশনে ছবিখানি বহুমূল্যে বিক্রিত হইল। ছেলেদের ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, ছবিখানি আঁকতে আমার বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নি। আমি ত অমনি বসে বসে ছবি আঁকি-ই। রাধু বেচারারই এ জন্যে পরিশ্রম হয়েছে বেশি। তাকে তিন দিন সমানে ছিপ-হাতে বসে থাকতে হয়েছে। সুতরাং ছবির দামটি তার প্রাপ্য।"

ছেলেরা সবই বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া পিতার কথায় সায় দিলেন। রাধু নাচিতে নাচিতে টাকা লইয়া বিবাহ করিতে বাড়ি ছুটিল। এই গল্পটি আমি মোহনলালের নিকট শুনিয়াছি।।

চাকরবাকরদের সঙ্গে কেহ রাগারাগি হাঁকাহাঁকি করিত না। এত বড় একান্নবর্তী পরিবার—সকলেই যেন সুরে-বাধ বাদ্যযন্ত্র। কোনদিন এই তার-যন্ত্রে বেসুরো রাগিণী বাজিতে শুনি নাই। এত লোক একত্ব থাকিয়া এই মহৎ সংযম কী করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ভাবিতে বিস্ময় লাগে। শুনিয়াছি, তিনি যদি কখনো কোন চাকরের উপর একটু গরম কথা বলিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ নিজের শাস্তিস্বরূপ তাকে দশটাকা বখশিস করিতেন। কোন কোন দুষ্ট চাকর তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিত। ইচ্ছা করিয়াই কাজে অবহেলা করিয়া তাকে রাগাইয়া এইভাবে বখশিস আদায় করিত। একদিন তিনি তাঁর নিজের অতীত-জীবনের একটি ঘটনা বলিলেন। সব কথা মনে নাই। ভাসা-ভাসা যাহা মনে আছে, তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

একবার তিনি পুরী বেড়াইতে গেলেন। সেখানে একটি মুসলিমপরিবারের সঙ্গে তার আলাপ হইল। কোথাকার কোন বৃদ্ধ জমিদারের পরিবার। বুড়োর তিন পুত্রবধূ আর দুই মেয়ে। তারা কেউ অবনবাবুকে দেখিয়া ঘোমটা দিত না। তাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানা রকমের মুসলমানি খানা খাওয়াইত। তাদের সঙ্গে করিয়া তিনি সমুদ্রতীরে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একদিন সকালবেলা বাড়ির সবাইকে লইয়া তিনি গল্পগুজব করিতেছেন। এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁর সঙ্গে পরিচিত হইলেন। অমুক স্থানের মহারাজা, অমুক সমিতির সভাপতি, অমুক কাগজের সম্পাদক ইত্যাদি কয়েকজন বিখ্যাত লোক তাকে ঘিরিয়া বসিলেন। পানির মাছ শুকনায় পড়িলে যেমন হয়, তার যেন সেই অবস্থা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি মনে করে আপনারা আমার কাছে এসেছেন?”

আগন্তুকের মধ্যে একজন একটু কাশিয়া বলিলেন, "মুসলমানেরা আজকাল শতকরা পঞ্চাশটি চাকরির জন্যে আবদার ধরেছে। আমাদের হিন্দুসমাজের যুবকেরা বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তারা এতগুলো চাকরি নিয়ে নেবে—এই অন্যায়ের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আজকাল গভন মেন্টও ওদের কথায় কান দিচ্ছে। আমরা রাজনৈতিক নেতারা এ জন্য বহু প্রতিবাদ করেছি। যাঁরা রাজনীতি করেন না, অথচ দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তাদের দিয়ে একটা প্রতিবাদ করাতে চাই। প্রতিবাদ-পত্র লিখে এনেছি। এতে জগদীশচন্দ্র, পি. সি রায় প্রভৃতি বহু মনীষী সই প্রদান করেছেন।"

অবনীন্দ্রনাথ শিশুর মত বিস্ময়ে বলিলেন, "তা আমাকে কি করতে হবে?"

তাঁর সামনে কাগজ-খাতা মেলিয়া ধরিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "বিশেষ কিছু না। শুধুমাত্র এখানে একটি সই।"

তিনি বলিলেন, "মুসলমানেরা যদি বেশি চাকরি পায়, তাতে আমার কি। আমার প্রজাদের মধ্যে প্রায় সবাই মুসলমান। তারা যদি দুটো বেশি চাকরি পায় তাতে আমি বাদ সাধতে যাব কেন?"

ভদ্রলোক তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যাইতে ছিলেন। পাশে আমি বসিয়া আছি। ভদ্রলোকের সমালোচনা শুনিয়া মনে ব্যথা পাইব, সেইজন্য অবনবাবু তাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এই যে, আমার জসিম মিঞা বসে আছে। ওর একটা চাকরির জন্যে আমি কত চেষ্টা করছি। ওর চাকরী হলে আমি কত খুশি হই।"

ভদ্রলোকেরা নানা ভাবে তাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সহি করিলেন না। তিনি বলিলেন, "মশায়, আমি রঙ আর তুলি নিয়ে সময় কাটাই, রাজনীতির কি বুঝি। রবিকাকার কাছে যান। তিনি ওসব ভাল বোঝেন।"

অগত্যা ভদ্রলোকেরা চলিয়া গেলেন। তিনি আবার আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব আরম্ভ করিলেন।

আমি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়িতাম। সেই সময় দীদেশবাবু আমাকে পল্লীগান সংগ্রহ করার ভার দেন। কলেজের ছুটির সময় আমি নানা গ্রামে ঘুরিয়া পল্লী-সংগীত সংগ্রহ করিয়া তাঁকে পাঠাইতাম। বিশ্ববিদ্যালয় এজন্য আমাকে মাসিক সত্তর টাকা করিয়া দিতেন। বি. এ. পাশ করিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়িতে কলিকাতা আসিলাম। দীনেশবাবু আমাকে বলিলেন, "এখন থেকে তুমি আর পল্লী-গান সংগ্রহ করে মাসে মাসে টাকা পাবে না এতদিন তুমি গ্রামে ছিলে, সেখানে পড়াশুনো করেছে, আর কি কি করছে কেউ জানত না। এখন তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করবে। লোকে আমার নিন্দে করবে, আমি তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দিচ্ছি।"

আমি বলিলাম, "আমি আগেও পড়াশুনো করেছি। ছুটির সময় শুধু গ্রাম-গান সংগ্রহ করতাম। আপনি আমার কাছে কাজ চান। আমি যদি আগের মত আপনাকে গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করে এনে দিতে পারি, তবে আপনার অসুবিধা কিসের?"

দীনেশবাবু বলিলেন, "তুমি জান না, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বহু শত্রু আছে। তারা যদি টের পায়, আমার জীবন অস্থির করে তুলবে।"

বহু অনুনয়-বিনয় করিয়াও আমি দীনেশবাবুকে বুঝাইতে পারিলাম না। বস্তুত এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশবাবুর পূর্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল না। স্যার আশুতোষের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্র শ্যামাপ্রসাদ তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

দীনেশবাবু বিশ্বকোষ লেনে থাকিতেন। দুপুরবেলা ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া বেহালা যাইতেন তাঁর নূতন বাড়ি তৈরীর কাজ দেখাশুনা করিতে। আমি প্রতিদিন দীনেশবাবুর সঙ্গে বেহালা যাই। সারাদিন তার সঙ্গে কাটাই। আর খুজি, কোন মুহুর্তে তাকে ভালমত বলিয়া তার মতপরিবর্তন করাইতে পারিব। দুই-তিন দিন যায়। একদিন আমার কথাটি পাড়িলাম। দীনেশবাবু তার পূর্বমতে অটল। আমার পরিবর্তে গ্রাম-গান সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি একজন লোককে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন।

এ সব কথা আমি অবনীন্দ্রনাথকে কিছু বলি নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাঁর কি হাত আছে? একদিন তার সামনে বসিয়া আছি। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওহে জসীমিঞা, মুখখানা যে বড় বেজার দেখছি।"

আমি তাঁকে সমস্ত খুলিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, "এটা বড় আশ্চর্য! আগে যদি পড়াশুনো করেই তুমি গ্রাম-গান সংগ্রহ করতে পেরেছে, এখন পড়াশুনো করে তা পারবে না কেন? তুমি এক কাজ কর। আমার একখানা চিঠি নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ আরকুহার্টের সঙ্গে দেখা কর।"

আমি বলিলাম, “এতে দীনেশবাবু যরি অসন্তুষ্ট হন?”

হাসিয়া বলিলেন, “তোমাকে যতদিন তিনি মাসে সত্তর টাকা করে দিয়েছেন, ততদিন তিনি রাগলে তোমার ক্ষতি হত। সেই টাকাই যখন শেষ হল, তখন রাগলে তোমার কি আসে যায়? তুমি আমার চিঠি নিয়ে আরকুহার্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা কর।”

পত্র লইয়া আমি ভাইস-চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমার সব কথা খুব মনযোগের সঙ্গে শুনিয়া বলিলেন, “এখন আমি তোমাকে কোন কথা দিতে পারি না। তুমি আমার নিকট একখানা দরখাস্ত কর। সিনেটে এ বিষয়ে আলোচনা হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব।”

আমি আসিয়া দীনেশবাবুকে সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন, “ভাইস-চ্যান্সেলর যখন তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন, তখন তুমি দরখাস্ত কর।” সেই দরখাস্তের মুসাবিদা দীনেশবাবুই লিখিয়া দিলেন। সেনেটে আমার বিষয়ে আলোচনা হইবার নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বে আমার বন্ধু অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী আমাকে লইয়া সেনেটের প্রত্যেক মেম্বরের বাড়ি ঘুরাইয়া আনিলেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও শ্যামাপ্রসাদবাবুকে ও স্যার, রাধাকৃষ্ণনকে ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া আমাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। সেনেটের আলোচনার দিনে, শুনিয়াছি, সকলেই আমাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। আমি পূর্বের মত অবসর সময়ে গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করিয়া মাসে সত্তর টাকা করিয়া পাইতে লাগিলাম। অবনবাবু শুনিয়া কতই খুশি হইলেন। এই টাকা দিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পড়ার খরচ চালাইলাম। অবনঠাকুর সাহায্য না করিলে ইহা হইত না।

-----------

*জোড়াসাঁকোবাড়িতে পুকুর ছিল না। দাদামশায় প্রায় কখনই জীবন থেকে স্টাডি করেন নি। রাধুর ছবি মন থেকেই এঁকেছিলেন। কিন্তু তবু ছবির জন্যে যেন রাধুরই কষ্ট হয়েছে বেশি, এই কথা বলেছিলেন।

মোহনলাল গাঙ্গুলি

০৭.

কলিকাতায় আসিয়া এখন ঘন ঘন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার দেখা হইতে লাগিল। একদিন তাহাকে বলিলাম, "দাদা মশাই, শুনেছি আপনাদের বাড়িতে লাল, ইয়াকুৎ, জহরৎ বহু রকমের মণিমাণিক্য আছে। রূপকথায় এগুলোর নাম শুনেছি। কিন্তু চক্ষে দেখিনি।"

তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন "তুমি দেখতে চাও?"

আমি বলিলাম, "যদি দেখান, বড় খুশি হব।"

তিনি বলিলেন, "পরশু সকালবেলা এসো। সকালের আলো না হলে মণিমাণিক্যগুলির রোশনাই খোলে না।"

নির্দিষ্ট সময়ে আমি তার সামনে উপস্থিত হইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এসেছ? আমার সঙ্গে এসো।"

তাঁর সঙ্গে চলিলাম। আমার মন রহস্যে ভরপুর। রূপকথার আলাদীনের মত আমি যেন অতীতের কোন রাজা-বাদশার অন্ধকার ধনাগারে প্রবেশ করিতেছি।

ঘরের এক কোণে একটি প্রকাণ্ড বাক্স। আমাকে তাহার ডালাটি তুলিয়া ধরিতে বলিলেন। ডালা তুলিয়া ধরিতে সেই বাক্সের ভিতর হইতে তিন-চারটি বাক্স বাহির করিলেন। প্রত্যেকটি বাক্স ভর্তি মুড়ি-পাথর—নানা আকৃতির, নানা রঙের।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, কত মণিমাণিক্য এখানে জড় হয়ে আছে।"

বাক্স হইতে এক একটি পাথর দেখাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এইটে লাল, এইটে ইয়াকু এইটে জহরৎ, আর দেখ এইটে হল নীলমণি। শ্রীকৃষ্ণের বুকে লটকান থাকত।"

বিস্ময়ে আমি হতবাক। অনেকক্ষণ সেই মণিমাণিক্য দেখিয়া বলিলাম, "আচ্ছা দাদামশাই, এগুলো এখানে এমন অসাবধানে রেখেছেন, বাক্সটায় তালা-চাবি পর্যন্ত লাগাননি। চোরে যদি চুরি করে নিয়ে যায়?"

নির্বিকার ভাবে তিনি বলিলেন, "চোর এগুলো মুড়ি-পাথর না মণিমাণিক্য তা জানার চোখ থাকা চাই। তাছাড়া সাবধানে কোন জিনিস রাখলেই চোরের উপদ্রব হয় বেশি। দেখ না, সকালবেলা ঘাসের শিশিরফোঁটায় কত মণিমাণিক্য জড় হয়। কেউ চুরি করে না। যদি তালা-চাবি দিয়ে কেউ বাক্সে আটকে রাখত, তবে রাতারাতি চুরি হয়ে যেত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা দাদামশাই, এই সব মণিমাণিক্য কত কালের?"

তিনি বলিলেন “বহু বহু আগের। হাজার হাজার বছর আগে এরা তৈরি হয়েছিল সমুদ্রের তলে। ভাল কথা, ওহে জসীমিঞা, তুমি ত দেখে গেলে আমার ধনরত্ন। কাউকে যেন বলে দিও না।”

আমি নীরবে সম্মতি জানাইলাম। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাঁর সামনে লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল। তিনি আমাকে কতই না বিশ্বাস করিয়াছেন। এই গুপ্ত ধনরত্নের কথা হয়ত তার ছেলেমেয়েরাও জানে না। তাই কিনা তিনি আমাকে দেখাইলেন। আমি বলিলাম, “দাদা মশাই, অন্ধকারে এগুলো ভাল মত দেখতে পাচ্ছিন। একটু বারান্দায় নিয়ে দেখব?”

হাসিয়া বলিলেন, “তা দেখ।”

আমি মণিমাণিক্য-ভরা দুই-তিনটি বাক্স বারান্দায় আনিয়া দেখিয়া অবাক হইলাম। ও মা, এ যে সবই মুড়ি-পাথর। মোহনলাল সামনে দিয়া যাইতেছিল, তিনি ডাকিয়া বলিলেন, “জসীমিঞা রোজ আমাকে ধরে মণিমাণিক্য দেখবে। আজ তাকে এগুলো দেখিয়ে দিলাম।”

মোহনলাল মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। পরে মোহনলালের কাছে শুনিয়াছি, বহুদিন আগে তার স্পর্শমণি পাওয়ার শখ জাগিয়াছিল। সেই উপলক্ষে তিনি নানা দেশ হইতে বহু মুড়ি-পাথর কুড়াইয়া আনিয়া জড় করিয়াছিলেন। গত দুই দিনে তিনি আরও কিছু পাথর সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ করিয়াছেন। আমার মত একটি সামান্য লোককে বিস্মিত করিবার জন্য এমন প্রচেষ্টা তাঁর কাব্যময় অন্তরের পরিচয় দেয়।

একবার অবনীন্দ্রনাথের খেয়াল চাপিল, যাত্রাগান করিবেন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের নহুস-মান্ধাতা-বিশ্বকর্মা প্রভৃতি নানা চরিত্র অবলম্বন করিয়া তিনি এক অদ্ভুত যাত্রার পালা রচনা করিলেন। তারপর এ-বাড়ির ও-বাড়ির ছেলেদের লইয়া সেই যাত্রাগানের মহড়া চলিতে লাগিল। মহড়ার সময় তার কি: মাতামাতি। ওখানটার বক্তৃতা থিয়েটারের মত হল; ঠিক যাত্রার দলেন রাজার মত বলা হল না। চোরের কথাটা চোরের মতই বলতে হবে; ভদ্রলোকের মত নয় ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। তিনি খবর পাইয়া বলিলেন, "অবন, কেমন যাত্রা করেছ দেখব।"

অবনীন্দ্রনাথের হলঘরে যাত্রার আয়োজন হইল। রবীন্দ্রনাথ আসিয়া আরামকেদারায় বসিলেন। এ-বাড়ির ও-বাড়ির আত্মীয়স্বজনেরা ও আসিলেন। এর আগেও একবার এই যাত্রার অভিনয় হইয়াছে। সেদিন দেখিয়াছি তার কী লাফালাফি! এখানে ওকে দাড় করাও, ওখান দিয়ে প্রবেশ কর, খাড়া হয়ে দাঁড়াও—এমনি হম্বিতম্বি। কিন্তু আজ তিনি রবীন্দ্রনাথের সামনে ভেজা-বেড়ালটির মত আসরের এককোণে ঢোলক লইয়া বসিয়া আছেন। মুখখানা একেবারে চুন। বহু হাসিতামাশার মধ্যে যাত্রার অভিনয় শেষ হইল। শ্রোতারা খুব উপভোগ করিল। রবীন্দ্রনাথ নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কোন কথা বলিলেন না।

পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথকে গিয়া ধরা হইল, যাত্রাগান কেমন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "নাটক জমেছিল খুব। কিন্তু এলোমেলো সব ঘটনা; একে অপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন; পরিণামে যে কী হল বুঝতে পারলাম না।"

এই কথা অবনীন্দ্রনাথকে জানাইলে তিনি বলিলেন, “এটাই ত নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাটক যখন জমেছে তখন কী যে হল, না-ই বা বুঝা গেল।”

একদিন তিনি ছবি আঁকিতেছেন। আমি বলিলাম, একজন সমালোচক আপনার ছবির সমালোচনা করে লিখেছেন, He is an wonderful wanderer, আপনি যখন মোগল আর্ট করেন তখন একেবারে সেই যুগের শিল্পীদের মধ্যে লোপ পেয়ে যান। আবার যখন চীনা আর্টিস্টদের মত আঁকেন তখন আপনি চীনা বনে যান। এ কথাই উদ্ধৃত করে একজন বাঙালি সমালোচক বলেছেন, আপনার নিজস্ব কোন বাণী নেই।”

তিনি হাসিয়া বলিলেন, “ওটাই আমার বাণী। যে এক জায়গায় বসে থাকে, সে ত মরে যায়। নানা পথে ঘুরে বেড়ানই আমার বৈশিষ্ট্য।”

আর একদিন তিনি বলিতেছিলেন, “প্রত্যেক দেশরই এক এক ভাষা। সেই ভাষায় কেউ না লিখে যদি অন্য ভাষায় লেখে, তবে তার লেখা হবে কৃত্রিম। এটা যেমন সাহিত্যের ব্যাপারে সত্য তেমনি শিল্পের ব্যাপারে। আমরা আমাদের নিজস্ব আর্টের ভাষায় অঙ্কন করেছি ভাষার ধারা ধরেই আমাদের আর্ট করতে হবে। অপরের অনুসরণ করে আমরা বড় হতে পারব না।

মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন হইতে নন্দলাল বসু আসিতেন তার সঙ্গে দেখা করতে। গুরুশিষ্যে আলাপ হইত। মুখের কথায় নয়। যেন অন্তরে অন্তরে—যেন হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বিনিময় হইত। গুরুর সামনে একটি চেয়ার লইয়া নন্দলাল বসতেন। গুরু ছবি

আঁকিয়া যাইতেন, মাঝে মাঝে দু-একটি কথা। ডাহুক-মাতা যেন গভীর রাত্রিতে তার বাচ্চাদের আদরের কথা শুনাইতেছে।

অবনীন্দ্রনাথের মুখে কতবার নন্দলালের একটি কাহিনী শুনিয়াছি। একবার শিষের একখানা ছবি দেখিয়া তিনি বলিলেন, এর background-এর রঙটি এমন না করিয়া অমন করিবে। শিষ্য নীরবে গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। রাত্রে তার মনে হইল, তিনি ভুল করিয়াছেন। শিষ্য ছবির background-এ যে রঙ দিয়াছেন, তাহাই ভাল। সারারাত্রি তাঁর ঘুম হইল না। কী জানি যদি তার কথা মত নন্দলাল ছবির রঙ পাল্টাইয়া থাকেন। ভোর হইতে তিনি তিন-চার মাইল দূরে শিষ্যের মেসে গিয়া দরজার টোকা মারিতে লাগিলেন। নন্দলাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন,“তোমার সেই ছবিটার রঙ ত পালটাও নাই?”

শিষ্য বলিলেন, “না, কাল সময় পাই নাই। এখন রঙটা পালটাব।”

গুরু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। “না না, ওটার রঙ পালটাতে হবে না। তুমি যা রঙ দিয়েছ, সেটাই ঠিক।” এই বলিয়া গুরু ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

নন্দলাল গুরুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে বাড়ির মেয়েদের তরফ হইতে ছোট ছেলেদের মারফতে নানা রকমের বায়না আসিত। কারো কানের দুলের ডিজাইন করিয়া দিতে হইবে, কারো হাতের চুড়ীর নকসা আঁকিয়া দিতে হইবে। অবসর-সময়ে নন্দলাল বসিয়া বসিয়া সেই ডিজাইনগুলি আঁকিতেন।

একদিন অবনবাবু বলিতে লাগিলেন, কি ভাবে তার শ্রেষ্ঠ ছবি ‘শাহজাহানের মৃত্যু অঙ্কিত হয় :

আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। শোকে তাপে আমি জর্জরিত। হাভেল সাহেব বললেন, করোনেশন উপলক্ষে দিল্লীতে একজিবিশন হচ্ছে। তুমি একটা কিছু পাঠাও। আমি কি করি মনও ভাল না। রঙ-তুলি নিয়ে আঁকতে আরম্ভ করলাম। আমার মেয়ের মৃত্যুজনিত সমস্ত শোক আমার তুলিতে রঙিন হয়ে উঠল। শাহজাহানের মৃত্যুর ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। আঁকতে আঁকতে মনে হল, সম্রাটের চোখে মুখে তার পিছনের দেয়ালের গায়ে আমার সেই দুঃসহ শোক যেন আমি রঙিন তুলিতে করে ভরে দিচ্ছি। ছবির পিছনের মর্মরদেয়াল আমার কাছে জীবন্ত বলে মনে হল। যেন একটা আঘাত করলেই তাদের থেকে রক্ত বের হবে। দিল্লীতে সেই ছবি প্রথম পুরস্কার পেল। কিছুদিন পরে হাভেল সাহেব আমাকে বললেন, এই ছবিটার একটি নকল আমাকে দাও। আমি ছবিটা কপি করতে আরম্ভ করলাম। নন্দলাল আমার পেছনে বসা। ছবি আঁকতে আঁকতে আমার মনে হচ্ছে, ছবির পেছনে মর্মর-দেয়াল যেন যুগ-যুগান্তর ধরে আমার সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে। ছবির যা-কিছু সব যেন আমার কাছে জীবন্ত। এই ভেবে আমার তুলি নিয়ে সেই পেছনের প্রসারিত দেয়ালের উপর তুলির টান দিতে যাচ্ছি, অমনি নন্দলাল আমার হাত টেনে ধরেছে : করেন কি, ছবিটা ত নষ্ট হয়ে যাবে! অমনি আমার জ্ঞান ফিরে এলো।

একবার অবনীন্দ্রনাথ চলিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে বক্তৃতা দিতে। আমি আর মোহনলাল স্থির করিলাম, তার বক্তৃতা আমরা লিখিব। আমরা দুইজনে নোট লইয়া বক্তৃতাটি লিখিয়া তাকে দিলাম। তিনি তাহার বহু অংশ পরিবর্তন করিয়া আবার মোহনলালকে দিয়া নকল করাইলেন।

এই প্রবন্ধটি উদয়ন পত্রিকায় ছাপা হইল। পত্রিকার সম্পাদক প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদে' নাম প্রকাশ করিলেন না। আমরা তাহাতেও খুশি ছিলাম কিন্তু তাকে ধরিলাম, এই লেখার থেকে যে টাকা আসিবে তা দিয়া আমরা সন্দেশ খাইব। প্রবন্ধের জন্য টাকা পাঠাইতে পত্র লেখাইলাম। সম্পাদক মাত্র পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া দিলেন। মোহনলাল ক্ষোভের সঙ্গে বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, দাদামশায়ের লেখা নিয়ে ওরা মাত্র পাঁচ টাকা পাঠাল? ওদের লজ্জা হল না?" তিনি কিন্তু নির্বিকার ভাবে পাঁচটি টাকাই গ্রহণ করিলেন। সন্দেশের কথা মনে করাইয়া আমরা আর তাকে লজ্জা দিলাম না।

অবনঠাকুরের কথা ভালমত জানিতে হইলে তাঁর বাড়ির অন্যান্যদের কথাও জানিতে হয়। যে সুন্দর পরিবারের কথা আমি বলিতেছি, তাহা আজ ভাঙিয়া চৌচির হইয়াছে। ফিউডাল যুগেরও শেষ হইয়া আসিতেছে। সেই জন্যই এদের কথা লিখিয়া রাখিলে হয়ত কাহারো কোন কাজে আসিতে পারে—অন্তত, ইতিহাসসন্ধানীর কিছুটা খোরাক মিলিবে।

এদের পরিবারে খুবই একটা সুন্দর শৃঙ্খলা দেখা যাইত। বহুভাবে এদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ হইয়াছে। কখনো এদের কাউকে আমি রাগারাগি করিতে দেখি নাই। ছোটর গুরুজনদের খুব সম্মান এবং ভক্তি করিত। গুরুজনেরা ছোটদের কিছু করিতে বলিলে তারা খুব মনোযোেগ সহকারে তাহা করিত। বাড়ির মেয়েরা থিয়েটার করিতেন, কেহ কেহ স্টেজে নাচিতেন, গান করিতেন; কিন্তু আত্মীয়-পরিজন ছাড়া বাইরের কারো সঙ্গে কথা বলিতেন না।

বন্ধুবর অজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়টি কোঠাঘর ভাড়া লইয়া আমি একবার প্রায় এক বৎসর ঠাকুরবাড়িতে ছিলাম। সেই উপলক্ষে আমি তাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখনো দেখিয়াছি, বাড়ির মেয়েরা বাইরের কারো সঙ্গে কথা বলিতেন না। কনকবাবুর মেয়েরা ইস্কুলে কলেজে পড়িতেন। তাঁহাদের ছোট ভাইদের মারফৎ কাউকে কাউকে দিয়া আমি মাঝে মাঝে কাজ করাইয়া লইয়াছি। জনান্তিকে অনুরোধ পাইয়া আমিও তাদের কাজ করিয়া দিয়াছি। আমি তাদের পরীক্ষার ফল জানিয়া দিতে টেবুলেটরদের বাসায় ঘোরাফেরা করিয়াছি। কিন্তু তাহারা কেহই আমার সঙ্গে কথা বলেন নাই। এর ব্যতিক্রম হইয়াছিল শুধু কয়েক জনের ক্ষেত্রে। তারা হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথের গৃহিণী, এবং তাঁর পুত্রবধু অলকবাবুর স্ত্রীমোহনলালের মামীমা। ভাল কিছু খাবার তৈরি হইলে তারা আমাকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। ছোট ছোট ছেলে দুইটি—বিশেষ করিয়া 'বাদশা' আমার বড়ই প্রিয় ছিল। কনকবাবুর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমার চারপাশে গুঞ্জরণ করিয়া বেড়াইত। তার ছোট মেয়েটির নাম মনে নাই। ভারি সুন্দর দেখিতে। আমি তাকে আদর করিতে কাছে ডাকিতাম। এতে বাড়ির আর আর ছোটরা তাকে ক্ষেপাইত, জসীমুদ্দীনবাবু তোর বর। সেই হইতে আমাকে দেখিলেই দৌড়াইয়া পালাইত। কনকবাবুর স্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলতেন না। আমি রাত্রে রুটি খাইতাম। একবার আমার জন্য তিনি এক বোতল আমের মোরববা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট মেয়ে দীপালিকে আমার বড়ই ভাল লাগত। সে তার মামাদের লইয়া খুব গল্প করিত। মোহনলাল তাকে ক্ষেপাইত, জসীমুদ্দীন তোমার মামা।" এতে সে খুব চটিয়া যাইত। কিন্তু আমার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। আমিও তাকে দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিতাম, "দিদি কেমন আছে?" সে হাসি গোপন করিয়া কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলিত, "আমার মা আপনার দিদি হতে যাবে কেন?" দীপালিকে কোনদিন

তার মার সঙ্গে দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিতাম, "দিদি ভাল আছেন ত?" দীপালি মায়ের আঁচলে মুখ লুকাইয়া আমাকে কিল দেখাইত।

মোহনলালও মাঝে মাঝে দীপালিকে ক্ষেপাইত, "আমি তোমার মোহন মামা, না দীপালি?" দীপালি রাগিয়া টং হইত। একবার দীপালির জন্মদিনে আ. আর মোহনলাল মিলিয়া দীপালিকে খুশি করিবার জন্য এক পরিকল্পনা করিলাম।

আমরা নিউমার্কেট হইতে বড় এক বাক্স চকলেট কিনিয়া আনিলাম। একটি কবিতা আমি আগেই লিখিয়া রাখিলাম। তাহা সেই বাক্সের মধ্যে পুরিয়া প্রকাণ্ড আর একটি বাক্সে সেই চকলেটের বাক্সটি পুরিয়া এক বাচ্চা কুলির মাথায় উঠাইয়া দীপালির ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম ঠাকুরবাড়িতে। কুলি আমাদের নির্দেশমত পার্শেলটি ঠাকুরবাড়ি দিয়া গেল। জন্মদিনে এতবড় একটি উপহার পাইয়া দীপালি খুশিও হইল, আবার শঙ্কিতও হইল। পার্শেলের গায়ে লেখা ছিল "মামাবাড়ির উপহার।" কিন্তু তার মামারা ত কোন জন্মদিনে তার নামে উপহার পাঠায় না। আর উপহার দিলে তারা নিজে আসিয়া দিয়া যাইত। এমন কুলির মাথায় করিয়া উপহার পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি? দীপালি পার্শেল লইয়া অন্দরমহলে ঢুকিল। অন্দরমহল আমার পক্ষে রুদ্ধদ্বার। মোহনলাল কোন একটা কাজের ছুতা করিয়া দীপালির পাছে পাছে ছুটিল। পার্শেল দেখিতে বাড়ির সবাই একত্র হইলেন। কিন্তু কী জানি ভয়ে দীপালি আর পার্শেল খোলে না। যদি ইহার ভিতর হইতে অকিছু বাহির হয়। কিন্তু ভালও ত কিছু বাহির হইতে পারে। পার্শেল না খুলিয়াই বা উপায় কি? বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা উৎসুক দৃষ্টি লইয়া চারিদিক ঘিরিয়া আছে।

অনেক ভয়ে ভয়ে দীপালি বাক্স খুলিল। পরতে পরতে কাগজের আবরণী খুলিয়া চকলেটের বাক্স। তাহার ডালা খুলিতেই আমার কবিতার সঙ্গে অসংখ্য চকলেটের টুকরা বাহির হইয়া পড়িল। আমার কবিতায় দীপালির মামাবাড়ির সম্পর্কে অহেতুক শ্রদ্ধার জন্য কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি ছিল। কিন্তু অসংখ্য চকলেটের গন্ধে এবং স্বাদে তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না। দীপালির জন্মদিনের কবিতা আমার 'হাসু' নামক পুস্তকে ছাপা হইয়াছে।

বাড়ির ছেলে বুড়ো যুবক সবাই খুব আমুদে প্রকৃতির ছিল। একটা কৌতুকের ব্যাপার পাইলে সকলে মিলিয়া তাহাতে যোগ দিত।

অবনীন্দ্রনাথের বাড়ির পাশে অ্যাডভোকেট বিপুল সাহার বাড়ি। ইনি নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রসিদ্ধ মামলায় পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপুল সাহার বাড়িতে সাধুসন্ন্যাসীর খুব আদর। একবার এক ভণ্ড সাধু আসিয়া তাদের পরিবারে প্রতারণা করিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

তবু সাধুসন্ন্যাসীতে তাদের বিশ্বাস কমে নাই। বিপুল বাবুর ছোটভাই ঘেটুবাবু একদিন মোহনলালের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। মোহনলাল আমাকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি জসীমুদ্দীন বাবু। ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ কালীসাধক। মা কালীকে সশরীরে দেখিতে পান।" শুনিয়া ঘেটুবাবু- আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

আমি বললাম, "মোহনলাল মিছে কথা বলেছে।"

মোহনলাল আমাকে চোখ ইসারা করিয়া বলিল, “কেন বিনয় করছ? ইচ্ছা করলেই তুমি মা-কালীকে দেখাতেও পার।”

আমি তখন ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, “যাকে তাকে কি দেখানো যায়?”

ঘেটুবাবু আমার পা-দুখানি ধরিয়া কাদ-কাঁদ ভাবে বলিল, “দাদা, আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। দেখবেন একদিন মা কালীকে?”

আমার মনে তখন দুষ্টবুদ্ধি আসিল। “মা-কালীকে আমি দেখাতে পারি সাতদিন পরে। এই সাতদিন তুমি রাগ করতে পারবে না, আর নিরামিষ খাবে।।”

ঘেটু বলিল, “দাদা, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব। কিন্তু মা-কালী আমাকে দেখাতেই হবে।”

তখন আমি তার ভক্তি আর ও জাগ্রত করিবার জন্য দুই-একটি গল্প ফঁদিলাম। কোথায় কোন্ শ্মশানঘাটে মড়ার উপর যোগাসন করিয়া বসিয়াছিলাম, কোন সাধকের মন্ত্রে সেই মড়াসুদ্ধ আমি আকাশে উড়িয়া চলিলাম, তারপর কৈলাসে বাবা শিবের সঙ্গে দেখা করিয়া কী করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আবার, কোথায় কার ছেলে মরিয়া গিয়াছিল, কোন সাধনায় আমি মা-কালীকে ডাকিয়া আনিয়া সেই মরা ছেলেকে বাঁচাইয়া দিলাম।

ভক্ত আমার কথাগুলি শুধু শুনিলই না, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া যেন গিলিয়া ফেলিল। দেখিলাম, যাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে তাহাদের ঠকাইতে বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। ফিরিবার সময় মোহনলালকে কানে কানে বলিয়া আসিলাম,

"এই সাতদিন তোমরা সবাই মিলে ওকে রাগাতে চেষ্টা করবে। রাগ হওয়া সত্ত্বেও ও যখন রাগবে না, তখন দেখতে খুব মজা।"

আমি মেছুয়াবাজার ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে চলিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, ব্যাপারটি এখানেই খতম হইল। কিন্তু মোহনলাল খতম করিবার লোক নয়। "তিন দিন পরে মোহনলাল আমাকে ফোন করিল, "তুমি যাবার পরে ঘেটু একেবারে কী রকম হয়ে গেছে। সব সময় তোমার নাম করে আর পাগলের মত ফেরে। তুমি তাকে শুধু মাছ-মাংস খেতে নিষেধ করেছ, খাওয়া-দাওয়াই সে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। আমার পড়ার ঘরে সে বসে আছে এখন। আমি তাকে ফোনে ডেকে দিই, তুমি তাকে কিছু সান্ত্বনা দাও।"

ঘেটু আসিয়া ফোন ধরিল। আমি তাকে বললাম, "ধ্যান ভরে আমি জানতে পেরেছি, তুমি একেবারে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু শরীরকে কষ্ট দিলে মা কালী বেজার হবেন। তুমি ভালমত খাও।"

ঘেটুর কণ্ঠস্বর গদগদ। সে বলিল "দাদা, আপনি দেবতা। আপনি সব জানতে পারেন। মা কালী কিন্তু আমাকে দেখাতেই হবে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

পরের দিন মোহনলাল নিজে আমার হোস্টেলে আসিয়া উপস্থিত। "ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে কালী তোমাকে দেখাতেই হবে। ঘেটুর বাড়ির সবাই জেনে গেছে। আরও অনেকের কাছে বলেছি। সুতরাং যেমন করেই হোক কালী তুমি দেখাবেই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি করে দেখাব?”

মোহনলাল বলিল, “আমি সব ঠিক করেছি। গবামামা। অর্থাৎ ঋতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) সুজনকে কালী সাজিয়ে দেবে। অন্ধকারের মধ্যে সে এসে ঘেটুকে দেখা দেবে।”

তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া নানারূপজল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম। মোহনলালের মামাত ভাইদের সাত-আটজনকে আমাদের দলে রাখিতে হইবে। তাহারা কে কেমন অভিনয় করিবে, তাহারও পরিকল্পনা তৈরী হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে আমি হগ-মার্কেট হইতে নানা রকমের ফল কিনিলাম। অসময়ের আম, লকেটফল—যা সচরাচর পাওয়া যায় না; কলা, কমলা আরও কত কি! এগুলি একটি থলিয়ায় পুরিয়া মোহনলালকে ফোন করিলাম। আমি বাড়ির পিছনের দরজা দিয়া এগুলি মোহনলালের কাছে পৌছাইয়া দিব। আমার মন্ত্র-পড়া শুনিয়া কালী যখন আসিয়া দেখা দিবেন, তখন আমাদের নির্দেশমত দর্শকদের মধ্যে যে যাহা খাইতে চাহিবে কালী তাহা দিয়া যাইবেন। তবেই ত হইবে সত্যকার কালী। টেলিফোনে মোহনলালের কাছে ওবাড়ির আরও নানা খবর জানিয়া লইলাম। ঘেটুর দাদা বিপুল সাহাও কালী দেখিতে আসিবেন। তাকে কালী দেখান ঠিক হইবে না। উকিল মানুষ, যদি ধরিয়া ফেলেন।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। আমি খদ্দরের ময়লা পাঞ্জাবি পরিয়া খালি পায়ে ঠাকুরবাড়ির পথে রওয়ানা হইব, এমন সময় বন্ধুর মনোজ বসু আসিয়া উপস্থিত। তখন ও মনোজ বসুর তত নাম হয় নাই। মাত্র দুই-একটি কবিতা ও ছোটগল্প বাহির হইয়াছে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সাহিত্যিক সঙ্গ করিতে আসিত।

সমস্ত শুনিয়া মনোজ বলিল, “আমি তোমার সঙ্গে যাব?”

আমি বলিলাম, “তা কি করে হবে?”

মনজ বলিল, “কেন? আমি তোমার শিষ্য হয়ে তল্পিবাহক হয়ে যাব।”

আমি খুশি হইয়া বলিলাম, “বেশ, চল তবে।”

১০.

খিড়কির দরজায় মোহনলাল দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে বুলিটি দিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে আমি সদর-দরজা দিয়া ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করিলাম। পূর্বনির্দেশমত মোহনলালের মামাতোভাইর। সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পুষ্পচন্দন লইয়া ঘেটু তারই একপাশে। আমাকে রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রা হলঘরে একটা জলচৌকির উপর বসিতে দেওয়া হইল। মনোজ অতি ভক্তিভরে চাদর দিয়া বসিবার জায়গাটি মুছিয়া দিল। আমি বসিতেই মোহনলালের ভাইরা পূর্ব নির্দেশমত একে একে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। একটি থালাভরা সন্দেশ আমার সামনে রাখিয়া ঘেটু আসিয়া আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, “দেবতা, আপনি গ্রহণ করুন।”

আমি স্বর্গীয় হাসি হাসিয়া বলিলাম, "এসব কেন এনেছ? আমি ত মা কালীকে না দিয়ে কিছু গ্রহণ করিনে। মা-কালী আসবেন সন্ধ্যার পরে।" ঘেটুর মুখ শুকনা হইয়া গেল। জোড়হাতে বলিল, আপনি শুধু একটু স্পর্শ করে দেন। ভক্তের মনে কষ্ট দেবেন না।"

অগত্যা আমি সেই সন্দেশ স্পশ করিয়া দিলাম। তারপর সমবেত ভক্তজনেরা তাহা কাড়াকাড়ি করিয়া ভাগ করিয়া খাইল। গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিলেও মাঝে মাঝে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। মনোজ তাহার ব্যাখ্যা করিল, "উনি দিব্য ধামে আছেন কিনা, তাই মাঝে মাঝে দেবতাদের নানা ঘটনা দেখিয়া হাসিয়া উঠেন।"

এমন সময় ঘেটুর বড় ভাই বিপুল সাহা আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন। আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলাম, "তোমার নাম বিপুল সাহা। একটা খুব বড় মামলার উকিল হয়েছ।"

বিপুলবাবু জোড়হাতে বলিলেন, "গুরুদেব আপনি দয়া করে আমাকেও যদি কালী দেখান, যারপর নাই খুসি হব।"

আমি বলিলাম, "কালী দেখতে হলে সাত দিন নিরামিষ খেতে হয়। তুমি তা করনি?"

বিপুলবাবু উকিল মানুষ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে সব ছেলের দল, ওরাও কি মাছ-মাংস খায়নি?"

তাহারা একবাক্যে সাক্ষ্য দিল, গত সাতদিন তাহারা মাছ-মাংস স্পর্শ করে নাই।

এমন সময় মনোজ গল্প ফাঁদিল” “গুরুদেব যাকে তাকে কালী দেখান না। ইন্দোরের মহারাজা সেবার গুরুদেবের পা ধরে কত কাঁদলেন, কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন না। আজ ঘেটুবাবুর বড়ই পুণ্যফল যে, তিনি কালী দেখতে পাবেন। গুরুদেব, কাল ধ্যানে বসে বুদ্ধদেবের সঙ্গে আপনার কি আলাপ হয়েছিল—একবার বলুন না?”

আমি লজ্জিত ভাবে বলিলাম, “ওসব কেন তুলছ? বুদ্ধদেব বড় কথা নয়। সেদিন চৌঠা আসমানের পরে যিশুখৃস্টের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে বললেন, কালী-সাধনাটা আমাকে শিখিয়ে যাও।”

এই বলিয়া আমি ধ্যানমগ্ন হইলাম। মনোজ চাদর দিয়া আমাকে বাতাস করিতে লাগিল।

বিপুলবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন। মোহনলাল আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, “সর্বনাশ, গবামামা বের হয়ে গেছে। কালী সাজানো হবে না। সুজনকে সাহেব সাজিয়ে আনতে পারি। ভাতে তাকে কেউ চিনতে পারবে না।”

আমি বলিলাম, “বেশ তাই কর।”

ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আমি ঘেটুকে ডাকিয়া বলিলাম, “ঘেটু, তুমি মা-কালীকে কেন দেখতে চাও?”

ঘেটু বলিল, “মা-কালীর কাছে আমি একটি চাকরির বর চাই। অনেক দিন আমি বেকার।”

আমি খুব স্নেহের সঙ্গে বলিলাম, “চাকরি ত মা-কালীকে দিয়ে হবে না। আমি একজন সাহেব ভুত আনি। তার কাছে তুমি যা চাইবে তাই পাবে।”

ঘেটু গদগদ ভাবে বলিল, “দাদা, আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।”

রবীন্দ্রনাথের অন্দরবাড়িতে যেখানে অভিনয় হয়, তার উত্তর দিকের ঘরে একটি বেদী আছে। সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সাধনা করিতেন। মোহনলালের ব্যবস্থা মত সেই বেদীর উপর আমার কালী-সাধনার আসন তৈরী হইল। দক্ষিণ দিকে সৌম্যেন ঠাকুরদের বারান্দায় এমনভাবে আলো জ্বালান হইল যেন এ পাশের অন্ধকার আরও গাঢ় দেখায়। চারিদিকে অন্ধকার। সেই বেদীর উপর আসিয়া আমি বসিলাম। ভক্তমণ্ডলী আমার দুইদিকে সামনে বসিল, ঘেটু আমার পাশে। সে কেবল বার বার আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে আর গদগদ কণ্ঠে বলিতেছে, “দাদা, আপনি ভগবান।”

বাড়ির মেয়েরা উপরতলার গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছেন।

একবার আমি এক তান্ত্রিক সাধুর শিষ্য হইয়া শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া অনেক ভূতান্তরী মন্ত্র ও আমার জানা ছিল। কতক পূর্বস্মৃতি হইতে, কতক উপস্থিত তৈরি করিয়া আমি ডাক ছাড়িয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলাম। প্রথম শরীর-বন্ধন করিয়া সরিষা-চালান দিলাম। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তর-মেরুতে, দক্ষিণ মেরুতে যোলশ ডাক-ডাকিনীর সঙ্গে আমার সরিষা উধাও হইয়া ছুটিল–

পিঙ্গলবরণী দেবী পিঙ্গল পিঙ্গল জটা<br>
অমাবস্যার রাতে যেন কালো মেঘের ঘটা

সেইখানে যায়া সরষে ইতিউতি চায়,
কাটা মুণ্ডু হতে দেবীর রক্ত ভেসে যায়।
এইভাবে সরষে ঘুরিতে ঘুরিতে–
তারও পূবেতে আছে একখানা শ্বেত দ্বীপ,
নীল সমুদ্রের উপরে যেন সাদা টিপ।
সেইখান থেকে আয় আয়, দেও-দানা আয়,
নীলা আসমান তোর ভাইঙ্গা পড়ুক গায়।

এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে খট করিয়া একটি শব্দ হইল। পুর্ব নির্দেশমত তিন চারজন ভক্ত অজ্ঞান হইয়া পড়িল। মোহনলাল হাত জোড় করিয়া বলিল, “হায়, হায়, গুরুদেব, এখন কি করি? এরা যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

আমি বলিলাম, “কোন চিন্তা করো না। যতক্ষণ আমি আছি, কোন ভয় নাই।”

পা দিয়া এক এক জনকে ধাক্কা দিতেই তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘেটু তখন ভয়ে কাঁপিতেছে, আর বিড়বিড় করিতেছে। মোহনলাল তার পাশে বসিয়া আছে স্মেলিংসল্টের শিশি লইয়া। যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখন উহা ব্যবহার করা যাইবে।

আমি আরও জোরে জোরে মন্ত্র পড়িতে লাগিলাম।

“আয় আয়—কালকেচণ্ডী আয়, শ্মশানকালী আয়—”

অদূরে সামনে আসিয়া সাহেবভূত খাড়া হইল। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কাছে আমি বলিলাম, “যার যা খাবার ইচ্ছে, সাহেব ভূতের কাছে চেয়ে নাও।”

একজন বলিল, “আমি আম খাব।” কেউ বলিল, “আমি বিস্কুট খাব।” বলিতে না বলিতে সাহেব তার ঝুলির ভিতর হইতে যে যাহা চায়, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। বিস্ময়ে ঘেটু কেবল কাঁপিতেছে। তাকে বলিলাম, “ঘেটু, তুমি কিছু চাও।”

মোহনলাল তাহার কানে কানে বলিয়া দিল, “বল, আমি লকেটফল চাই।”

ঘেটু তাহার নির্দেশমত বলিল “আমি লকেটফল চাই।”

আমি, ভুতকে বলিলাম, “শিগগীর লকেটফল নিয়ে এসো।” ভুত ইসারা করিয়া ‘না, না’ বলে। আমি বলি, “তা হবে না। তুমি এখনই সেই শ্বেতদ্বীপে গিয়ে লকেটফল নিয়ে এসো। অনেক দূর–কষ্ট হবে, তাই বলছ? কিন্তু মা-কালীর মুণ্ড চিবিয়ে খাবে যদি আমার কথা না শোন। দোহাই তোর দেব-দেবতার, দোহাই তোর কার্তিকগণেশের। আমার কথা রাখ।”

তখন ভূত অন্ধকারে মিশিয়া গিয়া খানিক বাদে একছড়া লকেটফল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঘেটু তাহা পাইয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়া কেবল বলিতে লাগিল, “দাদা আপনি মানুষ নন। সাক্ষাৎ ভগবান।”

তখন আমি ভূতকে বলিলাম, “তুই আরও এগিয়ে আয়। ঘেটুকে আশীর্বাদ করে যা। ঘেটুর যেন চাকরি হয়।”

ভূত আসিয়া ঘেটুর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিল। ঘেটু তবু সাহেববেশধারী সুজনকে চিনিতে পারিল না।

তখন আমি ঘেটুকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, "ভাই ঘেটু, সবই অভিনয়। তোমাকে নিয়ে আজ আমরা কিছু মজা করলাম। তোমার বন্ধু সুজন সাহেব-ভূত সেজে তোমাকে আশীর্বাদ করে গেল। তুমি কিন্তু চিনতে পারনি।"

কিন্তু ঘেটুর চেহারায় কোনও রূপান্তর হইল না। সে আমার কথা বিশ্বাস করিল না। পরদিন যখন সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিল, লোকের ঠাট্টার ভয়ে সাত-আটদিন ঘরে দরজা দিয়া রহিল। এখনো ঘেটুর সঙ্গে দেখা হইলে সেই পূর্ব রহস্যের হাসিতামাসার রঙটুকু আমরা উপভোগ করি।

এই রহস্যনাট্যের অন্যান্য অংশে যাহারা অভিনয় করিয়াছিল, তাদের সঙ্গে দেখা হইলেও এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া আমরা পরস্পর আনন্দ লাভ করি। দশে মিলিয়া ভগবানকে কেমন করিয়া ভূত বানান যায়, এই ঘটনাটি তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

১১.

শুনিয়াছি, মোহনলালের পিতা খুব বন্ধুবৎসল ছিলেন। সেই গুণ অনেকখানি মোহনলালের মধ্যে বর্তাইয়াছে। তার মত বন্ধু খুব কমই মেলে। যে কোন ব্যাপারে অসুবিধায় পড়িলে মোহনলাল তাহার সুরাহা করিয়া দিবে। "মোহনলাল; আজ টাকা নাই, এখনই আমার

একশ টাকার প্রয়োজন।” মোহনলাল হাস্যমুখে বলে, “কোন চিন্তা নেই। এখনই এনে দিচ্ছি।” “মোহনলাল, আমার রিসার্চ-স্কলারশিপের রিপোর্ট কালই দাখিল করতে হবে। এতগুলো পৃষ্ঠা কি করে নকল করব একদিনের মধ্যে?” মোহনলাল বলে, “কোন চিন্তা নাই। আমি নকল করিয়ে দিচ্ছি।” মোহনলাল আমার কাছ হইতে কাগজ লইয়া তার মামাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিলি করিয়া দিল। এক রাতের মধ্যে সমস্ত কাজ হইয়া গেল।

“মোহনলাল, টাকা নেই, রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার দেখব।” মোহনলাল পিছনের দরজা দিয়া আমাকে ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া আসিল।

বই-এর পাণ্ডুলিপি তৈরী করা, প্রচ্ছদপটে ছবি আঁকান প্রভৃতি কত কাজই সে আমাকে হাসিমুখে করিয়া দিয়াছে! তার সঙ্গে মতের কোন অমিল হইত না কোনদিন। আমি যদি বলিতাম “হু” সে বলিত “হঁ।”। কোনখানে বেড়াইতে যাইতে, কাউকে অসময়ে গিয়া বিরক্ত করিতে—যখন যে-কোন অসম্ভব কাজে তাহাকে ডাকিয়াছি, সে বাতাসের আগে আসিয়া সাড়া দিয়াছে।

একদিন জ্যোৎস্নারাত। আমরা দুইজনে বসিয়া গল্প করিতেছি। রাত প্রায় একটা। আমাদের খেয়াল হইল, চল, আব্বাসউদ্দীন সাহেবকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দিয়া আসি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি হইতে রিকসায় চাপিয়া চলিলাম পার্ক সার্কাস। বৌবাজার হইতে দুইজনে দুইগাছি ভাল বেলফুলের গোড়ের মালা কিনিয়া লইলাম।

আব্বাসউদ্দীন থাকিত কড়েয়া রোডের এক মেসে। বড়ই ঘুমকাতুরে। ঘুম হইতে জাগাইতে সেত রাগিয়া অস্থির। আমরা অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিলাম, “হে গায়ক প্রবর, আজ আমরা দুই বন্ধুতে স্থির করিলাম, অখ্যাতবিখ্যাত আব্বাসউদ্দীন সাহেবকে রজনী যোগে গিয়া ফুলের মালা পরাইয়া আসিব। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া এই মাল্য গ্রহণ করুন।”

দুই জনে তাহার গলায় দুইটি মালা পরাইয়া দিলাম। বন্ধুবর হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। তারপর বহু ক্ষণ গল্প গুজব করিয়া জোড়াসাঁকো ফিরিয়া আসিলাম। পথের দুই ধারে ফুটপাথের উপর সারি সারি গৃহহীন সর্বহারারা শুইয়া আছে। মাঝে মাঝে রিক্সা থামাইয়া বহুক্ষণ তাহাদের দেখিলাম। মোহনলাল দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “এদের কবিতা কোন কবি লিখবে?”

মোহনলালকে লইয়া আরও কত আমোদ করিয়াছি! কোন কোন দিন আমাদের নাচে ইত। নাচের উপযুক্ত গান তৈরী করিয়া তখন তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া মোহনলালের ভাইদের শিখাইয়া দিতাম। কেহ একটা ঢোলক আনিয়া বাজাইতে বসিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের নাচ চলিত। এই আসরে নরেন্দ্রনাথ, ব্বতীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে আসিয়া যোগ দিতেন।

দোলের দিনে ওদের বাড়ি খুব আমোদ হইত। একবার দোলের সময় আমি ঠাকুরবাড়ির সবাইকে তামাসা করিয়া একটি কবিগান ব্রচনা করিয়া ছিলাম। বাড়ির ছেলেরা সেই কবিগানের ধুয়া ধরিয়াছিল। ব্বতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম–

ব্বতীনবাবু সর্বসময়
ব্যস্ত আছেন ভারি,
সবই কিন্তু পরের তরে
কোন কাজ নেই তারি

কনকবাবু অধিক সময় জমিদারির কাজ দেখিতে মফস্বলে ঘোরেন, মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকো আসিয়া উদয় হন; কে খুব খাইতে পছন্দ করে কে গান গাহিতে ঘাড় নাচ'য়; কে সারা দিন বসিয়া শুধু নভেল পড়ে—ইত্যাদির বর্ণনায় গানটি ভরা ছিল। আমরা নাচিয়া নাচিয়া সেই গান গাহিয়া খুব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম।

নীচের তলার ঘরে মাঝে মাঝে বসিয়া আমরা যত সব আজগুবি গবেষণা করিতাম। এই কাজে ব্রতীন্দ্রনাথের বুদ্ধি ছিল খুব প্রখর। একদিন আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হইল—রবীন্দ্রনাথ কবি নন, একেবারেই নকল—তাহাই প্রমাণ করা। এক একটি করিয়া, পয়েন্ট টোকা হইল–

১। রবীন্দ্রনাথ খুব ভাল খাইতে পছন্দ করেন। কোন কবিই বেশি খান না।

২। কবিদের দেখা যায়, সন্ধ্যা-সকাল আকাশের দিকে বিভোর ভাবে চাহিয়া থাকিতে। রবীন্দ্রনাথ শেষরাত্রে উঠিয় স্নান করিয়া অনেক গুলি সন্দেশ খাইয়া লিখিতে বসেন। সুতরাং তিনি যাহা লেখেন, তাহা সেই সন্দেশ খাওয়ারই প্রভাব। সত্য সত্য তাহার ভিতরে কোন কাব্য নাই।



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

৩। বহু বৈষ্ণব কবিতা তিনি নকল করিয়া মারিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার পশারিণী' কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি মাঝে মাঝে কাসিয়া উঠেন। তাহাও নিতান্ত অকবি-জনোচিত।

৪। যেহেতু তিনি জমিদারি কার্যে অত্যন্ত সুদক্ষ, সুতরাং কবি হইতে পারেন না।

৫। তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমেই কর্কশ হইয়া যাইতেছে। কেমন ভাবলেশহীন। ইহা সত্যকার কবির লক্ষণ নয়।

এইভাবে যে যত পয়েন্ট বাহির করিতে পারি, তাহার তত জিত হইত। এই সব আলোচনার পরে রবীন্দ্রনাথের গান বিকৃত করিয়া গাওয়া হইত। এই কাজে আমি ছিলাম বোধহয় সব চেয়ে অগ্রণী। আমার না ছিল তাল-জ্ঞান, না ছিল সুর-জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে ভাটিয়ালি সুরে গাহিয়া সকলের হাস্যের উদ্রেক করিতাম। এই জন্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতর্কিতে একদিন আমাদের সভায় ঢুকিয়া আমাকে তাড়া করিয়াছিলেন। তার সব চাইতে ক্রোধের কারণ, আমার বেতালা সুরে গান গাওয়া। অন্য কোন কারণে কেহ কোনদিন তাঁকে রাগিতে দেখেন নাই, কিন্তু তার সামনে বেতালা বেসুরো করিয়া কেহ গান গাহিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিয়াই আমরা বেতালা সুরে গান গাহিয়া তাকে রাগাইয়া দিতাম। আমার রচিত গ্রাম-গান তিনি খুব ভালবাসিতেন। তিনি আমাকে কথা দিয়াছিলেন, "তোমার গ্রাম্য-গানগুলির স্বরলিপি করিয়া আমি একটি বই তৈরী করিয়া দিব।" কিন্তু অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ইহা ঘটিয়া উঠে নাই।

একবার নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলন হয়। খুব সম্ভব ১৯৩০ সনে। দিনু দা সেই সম্মেলনে পল্লীসঙ্গীত বিভাগে আমাকে বিচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময় এই সম্মেলন বসে। তখন আমি বাড়ি চলিয়া আসি। সেইজন্য উহাতে যোগদান করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর দল লইয়া কলিকাতায় অভিনয় করিতে আসিতেন। এই উপলক্ষে সাত-আট দিন ঠাকুরবাড়িতে অনস্বরত রিহার্সাল। বাহিরের কাহারো প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। দিনু-দাকে অনুরোধ করিতেই তিনি আমাকে রিহার্সাল শুনিবার অনুমতি দিলেন।

দিনু-দার পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের গানের মহড়া যাঁহার না শুনিয়াছেন, তাহারা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের একটা খুব বড় জিনিস। উপভোগ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন গান দিনু-দা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের শিখাইতেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে গানের পাখি বাহির হইয়া নানা কণ্ঠে সুরের ডানা মেলিয়া ঘুরিত। এ যেন পক্ষি-মাতা তার শাবকগুলিকে ওড়া শিখাইত। তাদের ভীরু অপটু সুরের সঙ্গে তাঁর সুদক্ষ সুর মিলিয়া রিহাসেলের আসরে যে অপূর্ব ভাব-রসের উদ্রেক হইত, তাহার তুলনা মেলে না। সেই ভাব-সমাবেশ প্রতিদিন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইত। এক একটি রিহাসেলে গান এমনই জমিত যে, স্টেজে প্রকৃত গানের আসরে তাহার শতাংশের এক অংশও জমিত না। প্রতিদিন আমি দিদার গানের রিহাসেলের সময় বসিয়া অপূর্ব সঙ্গীত-সুধা উপভোগ করিতাম।

১২.

দিনুদা সকলের নিকট অবারিতদ্বার। কারও কোন উপকার করিতে পারিলে যেন কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। শৈলেনবাবু নামে এক ভদ্রলোক ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা আসেন। পল্লী-সঙ্গীতে -তাহার খুব নৈপুণ্য ছিল। কিন্তু অর্থ ভাবে কলিকাতা আসিয়া তিনি বিশেষ কিছু করিয়া লইতে পারেন নাই। দিনুদা তাকে একটি হারমোনিয়াম উপহার দিয়াছিলেন। দিনুদার মৃত্যুর পর আমি একটি কবিতা লিখিয়া বিচিত্র কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

এ বাড়ির এতসব লোকের কথা এমন করিয়া ইনাইয়া-বিনাইয়া কেন বলিতেছি, পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের কথা সকলেই জানিবেন, কিন্তু সেই মহাতরুদ্বয়ের ছায়াতলে তিম্ভে তিলে যারা নিজেদের দান করিয়া তরুর বুকে শত শাখাবাহুবিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁদের কথাও কিছুই লিখিত থাকা উচিত। সঙ্গীত-জগতে দিনুদা যদি অন্য পথ ধরিতেন, তবে হয়ত আরও বেশী সুনাম অর্জন করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু মহাকবি যশ-সমুদ্রের তরঙ্গে তিনি সব কিছু স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বড় হইয়াছিলেন, এ যেন দিদার নিজেরই সাফল্য। এ কথা শুধু দিদার বিষয়েই খাটে না। ঠাকুর-পরিবারের সমস্ত লোক এই প্রতিভাদ্বয়কে নানা রকম সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতে যে-কোন সময় প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন।

অবনীন্দ্রনাথের নীচের তলায় এক ঘরে বসিয়া গবাদা (ব্বতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ছবি আঁকিতেন। পাশে তাঁর শিষ্য অম্বি, প্রশান্ত এরাও ছবি আঁকিতেন। ওঘরে অলক বাবু ছবি আঁকিতেন। সমস্ত বাড়িটা যেন ছবির রঙে ঝকমক করিত। গবাদ এখন ছবি আঁকেন না। সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম আকাশের মেঘ কাটিয়া গেলে সবুজ ধানের ক্ষেতের উপর যে আবছা আলোর একটু মৃদুপেলব স্পর্শ দেখা যায়, তারই মোহময় রেশ তিনি ছবিতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন। আমার ধানক্ষেত পুস্তকের প্রচ্ছদপটের জন্য তিনি অমনি একখানা

ছবি অকিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্লক করিয়া ছবি ছাপাইয়া দেখা গেল, সেই আবছা আলোর মোহময় রেশটি ছবির ধানক্ষেতের উপর রক্ষিত হয় নাই। আমার মন খারাপ হইয়া গেল। গবাদাকে এ কথা বলিতে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ ছবিতে যা এঁকেছি হাফটোন ব্লকে তার অর্ধেকটা মাত্র ধরা দেবে। সবটা পাওয়া যাবে না। এ জন্য দুঃখ করো না।"

সারাটি সকাল গবাদা ছবি আঁকিতেন। তারপর আর তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে কোথায় একজিবিশন হইবে, কোন কলেজে ছেলেরা নাটক অভিনয় করিবে—সাজানোগোছানোর ভার গবাদার উপর। ভারবোঝ তাহাকে দিতে হইত না, তিনি নিজেই যাচিয়া ভার গ্রহণ করিতেন। কোন কোন অনুষ্ঠানে তিন-চার দিন অনাহারে অনিদ্রায় একাদিক্রমে কাজ করিতেন। অনুষ্ঠানের কার্যসূচিতে তার নাম পর্যন্ত ছাপা হইত না। এ সব তিনি খেয়ালও করিতেন না।

বহুদিন বহু গ্রামে ঘুরিয়া আমি নানা রকমের পুতুল, নক্সীকাঁথা, গাজীর পট, পিঁড়ি-চিত্র আলপনা-চিত্র, ব্যাটন, সিকা, পুতুলনাচের পুতুল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন এইগুলি দিয়া কলিকাতায় প্রদর্শনী খুলিতে। কিন্তু কে আমার প্রদর্শনী দেখিতে আসিবে? প্রদশনী খোলর আগে বড় বড় নামকরা দুএকটি মতামত সংগ্রহের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ঘরের ছাতে গবদা এই সংগ্রহগুলি উত্তম করিয়া সাজাইয়া রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া আনিলেন। অবনীন্দ্রনাথও আসিলেন। তখন আমার মনে কত আনন্দ! এতদিনের পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে হইল। রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ আমার সংগ্রহগুলির এটা-ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ত পুতুল নাচের পুতুলগুলি দেখিয়া খুশিতে বিভোর।

সমস্ত দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার ইচ্ছা করে, এমনি পল্লীশিল্পের রকমারি সংগ্রহ আমার শান্তিনিকেতন সংরক্ষিত করি।"

দিনে দিনে আমার সংগ্রহগুলির বহর বাড়িতেছিল। এই সংগ্রহগুলি কোথায় রাখিব, সেই ছিল আমার মস্তবড় সমস্যা। কবিকে বলিলাম, "আপনি যখন পছন্দ করেছেন, এগুলি শান্তিনিকেতনে নেবার ব্যবস্থা করুন। এগুলি আপনাকে যে আমি দিতে পারলাম, এটাই আমার বড় গৌরবের কথা। আপনার ওখানে থাকলে দেশবিদেশের কলারসিকেরা নখে আনন্দ পাবেন। নতুন শিল্পীরা তাদের শিল্পকাজে প্রেরণা পাবে। এটাও কি কম কথা?"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি নন্দলালকে এগুলি নিয়ে যাবার কথা বলব।"

নন্দলাল বাবু আমার সংগ্রহগুলি একবার আসিয়া দেখিলেন, কিন্তু লইয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। দুই-একদিন তাকে তাগিদ দিয়া আমিও নিরস্ত হইলাম। পল্লী-শিল্পের এই প্রদর্শনী দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা তৎকালীন পত্রিকা গুলিতে ছাপা হইয়াছিল।

পরে আমার এই শিল্পকলার নিদর্শনগুলি দিয়া কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে আমরা একটি প্রদর্শনী খুলিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে সেখানে আমাকে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হয়। এই শিল্পগুলির কোনটি কি ভাবে কাহারা তৈরী করে, কোথায় কি উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়, এর সঙ্গে কি কি পল্লীগান ও ছড়া মিশিয়া রহিয়াছে, এই শিল্পগুলি আমাদের গ্রাম্যজীবনের আনন্দবর্ধনে ও শোকতাপ হরণে কতটা

সাহায্য করে, রঙে ও রেখায় কোথায় এই শিল্প কোন রূপময় কাহিনীর ইঙ্গিত বহিয়া আনে, আমি আমার বক্তৃতায় এই সব কথা বলিয়াছিলাম।

সভাপতির ভাষণে শ্রদ্ধেয় কালিদাস নাগ মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা আমার সমস্ত বলাকে ম্লান করিয়া দিল। কিন্তু বক্তৃতা শুনিয়া গর্বে আমার বুক সাত হাত ফুলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবীর শিল্পকলা তার নখদর্পণে। তিনি বলিলেন, "আজ ইউরোপের একদল শিল্পী তাঁদের যুগযুগান্তরের শিল্পকলার পথকে নিতান্ত বাজে আখ্যা দিয়ে লোকশিল্পের সুধা-আহরণে মশগুল হয়েছেন। সেই আলো-আঁধারী যুগের স্তম্ভের গায়ে পাথরের গায়ে যে সব ছবির ছাপ রয়েছে, তারই উপরে তারা নতুন শিল্পকলা গড়ার সাধনা করছেন।"

সেই বক্তৃতার মধ্যে তিনি গর্গার জীবনের কাহিনী অবতারণা করিলেন। সারা জীবনের শিল্প-সাধনাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি টিহিটি দ্বীপে গিয়া সমুদ্রতীরে উলঙ্গ হইয়া সেই আদিম যুগের বাসিন্দাদের মত সূর্যোদয় দেখিয়া তাহাদের মত বিস্ময় অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেন। এই কাহিনী তিনি এমন সুন্দর করিয়া বলিলেন, যাহার রেশ আজও ছবির মত আমার মনে আঁকিয়া আছে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন ঘোষ, বীরেন ভঞ্জ এবং আরও কয়েকজনের চেষ্টায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের হলে আমার সংগ্রহগুলির আর একটি প্রদর্শনী হয়। তারা সকলেই চাহিতেন, গ্রাম্য লোক-শিল্প এবং লোক-সংস্কৃতির প্রতি আমার যে অনুরাগ, তাহা আরও দশজনে অনুভব করেন; কোন অর্থবান লোক আসিয়া আমার এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

আজ তারা কে কোথায়, জানি না। আমার সেই নিঃসহায় প্রথম জীবনে তারা যে ভাবে আমাকে উৎসাহিত করিতেন, তাহা ভাবিয়া আজিকার অসাম্যের দিনে আমার দুই নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয়। '

গবাদী পূর্বের মতই আমায় এই প্রদর্শনীর দ্রব্যগুলিকে যথাস্থানে সাজাইবার ভার নেন। প্রতিদিন স্ত্রী-পুরুষ বহুলোক আসিয়া এই প্রদর্শনীতে ভীড় করিত।

গ্রীষ্মের ছুটিতে একটি বড় বাক্সের মধ্যে এই শিল্পনিদর্শনগুলি সাজাইয়া বন্ধুবর অজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে রাখিয়া আমি দেশে যাই। ছুটির পরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুরবাড়ির দারোয়ান আমার সংগ্রহগুলি বাক্স হইতে ফেলিয়া দিয়া সেখানে তাহার কাপড়চোপড় বোঝাই করিয়াছে। সংগ্রহগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, আবর্জনা মনে করিয়া সে ফেলিয়া দিয়াছে। একথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। আজও মন বলে, কোন বিশিষ্ট পল্লীশিল্প সংগ্রাহক কোন লালের সাহায্যে আমার সংগ্রহ গুলি কবল করিয়াছিলেন। তাঁর সংগৃহীত নিদর্শনগুলি তিনি বহুলোককে দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাকে দেখান নাই।

আজও একান্ত মনে বুসিয়া থাকিলে আমার মানসনয়নে কে যেন সেই নক্সীকাঁথাগুলি মেলিয়া ধরে। তার উপরে পুতুলগুলি, গাজীর পট, মনসাপূজার সরা, বিবাহের পিড়ি চিত্র একের পর এক আসিয়া কেহ নাচিয়া কেহ গান করিয়া যার যার অভিনয় নিখুতভাবে সমাধা করিয়া যায়। এক এক সময় ভাবি, এই সব জিনিস ভালবাসিবার মন যদি বিধাতা দিলেন, এগুলি সংগ্রহ করিয়া ধরিয়া রাখিবার অর্থসঙ্গতি আমাকে দিলেন না কেন? ভাবিয়া কিছু সান্ত্বনা পাই, আমার বন্ধু দেবপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতায় আশুতোষ

মিউজিয়ামে, ও শিল্পী জয়নুল আবেদীন তাঁর আর্ট-ইস্কুলে পল্লী-শিল্পের নিদর্শনগুলি অতি যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ১৯৩২ সনে কিছুদিনের জন্য আমি বন্ধুর অজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নীচের তলায় কয়েকটি ঘর ভাড়া লইয়া ঠাকুর-বাড়িতে থাকিতাম। ও-পাশে দোতলায় থাকিতেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহুকাল ইউরোপ ঘুরিয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন—নানান দেশের নানান অভিজ্ঞতা লইয়া বহুজন-সমাগমপূর্ণ বাড়ির এই ভদ্রলোক যেন আর এক দেশের মানুষ। আর সব বাড়িতে আর্টের কথা, সাহিত্যের কথা, নাট্যকলার কথা। সৌম্যেন ঠাকুরের ঘরে কুলীমজুরের কথা, চাষীর কথা—লোকের অন্নবস্ত্রের কথা। এ বাড়িতে ও-বাড়িতে লোক আসিত মোটরে করিয়া। তাহাদের গায়ের সুগন্ধী প্রলেপের বাসে বাতাস সুরভিত হইত। সৌম্যেন ঠাকুরের ওখানে আসিত ছোঁড়া খদ্দর-পরা কোন প্রেসের পদচ্যুত কম্পাোজিটর; নিকেলের আধরঙা চশমাজোড়া কোন রকমে কানের সঙ্গে আটকাইয়া আলিত গোবিন্দ-মিলের ফোরম্যান বুকপকেটে রাঙা রেশমী রুমালেব আর্ধেকটা ঝুলাইয়া চটিজুতা পায়ে আসিত চট্টগ্রামের জাহাজী রহিমুদ্দীন, ছেড়া পাঞ্জাবীর উপর ওভারকোট পরিয়া জর্দাকিমাম সহ পান চিবাইতে চিবাইতে আসিত মেছুয়াবাজারের বছিরদ্দি। এদের লইয়া সৌম্যেন সারাদিন কী সব গুজুর-গুজুর করিত। এ-বাড়ির ও-বাড়ির লোকেরা ঠাট্টা করিয়া বলাবলি করিত, “দেখ গিয়ে ওখানে নতুন কাল মার্কসের উদয় হয়েছে।”

এই সামান্য লোকদের লইয়া সৌম্য মহাশক্তিমান বৃটিশসিংহের কি ক্ষতি করিত, জানি না। কিন্তু প্রতিমাসে দুইবার তিনবার তার বাড়ি খানাতল্লাসী হইত।

এ-বাড়ির ও-বাড়ির লোকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, ওসব সাজানো খানাতল্লাসী। খানাতল্লাসী করাইয়া সে পলিটিক্সে নাম করিতে চায়; খবরের কাগজে নাম উঠাইতে চায়। কিন্তু খবরের কাগজগুলি যাঁদের হাতে, সৌম্য তাদেরও গাল পাড়িত; তাদের বরখাস্ত কর্মচারীদের লইয়া ফুসুর-ফুসুর করিত। খবরের কাগজে তার নাম উঠিত না। এ-বাড়ির ও-বাড়ির লোকদের চলা-বলার ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া সৌম্য তাদের ঠাট্টা করিত, গাল দিত, আর ভবিষ্যৎবাণী করিত "এদের তাসের ঘর ভাঙল বলে। দেশের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। মানুষের অভাবের কথা এরা বোঝে না, বুঝতে চেষ্টাও করে না। মিথ্যার উপরে এদের বেশাতি; প্রজার রক্তের উপর এদের জমিদারী। এদের সব-কিছু একদিন ভেঙে পড়বে। দেখছ না, এরা সব কেমন অলসের দল! এদের নিত্যকার গল্প ওখানে গেলুম। অমুক এলেন, অমুক গেলেন, গল্পটা এমন জমল জান! ওদের বাড়ি সেদিন যা খেলুম—এমন ভাল হয়েছিল রান্নাটা! সেদিনকার অভিনয় বেশ ভাল জমেছিল।—এইসব হল এদের নিত্যকার আলোচনা। যাঁরা প্রতিভা, তারা দিনরাত খাটছেন, তপস্যা করেন। কিন্তু সেই প্রতিভাগুলির সঙ্গে পরগাছাগুলো কী মধুর আলস্যে দিন কাটাচ্ছে। কোন কাজ করে না; কোনকিছু জানতে চায় না। এদের পতন একদিন হবেই।" সন্ধ্যার সময় সৌম্যের গুণগ্রাহীর দল চলিয়া যাইত। তখন ছাদে বসিয়া তাহার কাছে শুনিতাম নানান দেশের গল্প; ইতিহাসের নানা রকমের কাহিনী। সৌম্য কিছুই মানে না। গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া নাজিমুদ্দীন সাহেব পর্যন্ত সবাইকে গাল দেয়। হিন্দু দেবদেবী, আল্লা, ভগবান, ব্রহ্মসমাজের কাহাকেও সে বাদ দেয় না। নিজের আত্মীয়স্বজনের ত কথাই নাই। সৌম্য সবাইকে সমালোচনা করে। আমার পক্ষে তার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলা বড়ই মুস্কিল। মাঝে মাঝে তুমুল তর্কের অগ্নিদহনের পাশ দিয়া স্নেহের প্রতিমূর্তি সৌম্যের মা আমাদের দিকে একটু চাহিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

সৌম্যের তর্কের আর এক মজা, সে আপোস করিতে জানে। তার মত হইতে সে এক ইঞ্চি ও এদিক-ওদিক হইতে চায় না। যখন তর্কে হারিয়া যাই, তাকে গাল দিই: "তুমি সেই চিরকালের ভুৎমার্গী বামুনপণ্ডিত। তোমার ছোঁয়াছুয়ির ছুৎমার্গ আজ রূপগ্রহণ করেছে তোমার উৎকট মতবাদে। তোমার সঙ্গে যার মতের মিল নেই, তাকে তুমি অস্পৃশ্য বলে মনে কর।" সৌম্যও আমাকে বলে, "কাঠমোল্লা তোমার মুখে দাড়ি নেই, কিন্তু তোমার দাড়ি ভর করেছে তোমার সেকেলে মতবাদে।"

সৌম্যকে বলি, "তুমি ঈশ্বর মান না, কিন্তু আর্ট-সাহিত্য ত মান? আজ ঈশ্বরকে বাদ দিলে জগতের কত বড় ক্ষতি হবে জান? মধ্যযুগের খৃস্টান-গির্জাগুলিতে দেখে এসো, রঙের রেখার ইন্দ্রজালে অচির সৌন্দর্যকে চিরকালের করে রেখেছে। ভারতবর্ষের মন্দির আর মসজিদগুলিতে দেখ, যুগে যুগে কত রঙ-পিপাসুর দল তাদের কালের যা-কিছু সুন্দর, অমর অক্ষরে লিখে রেখে গেছে। এগুলি দেখে আজ আমরা কত সান্ত্বনা পাই।"

সৌম্য আমার কথাগুলি বিকৃত ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিয়া উত্তর দেয়, "আহা মরি মরি রে! কালীর মন্দিরে মানুষ বলি দেওয়া, দেবস্থানে দেবদাসী রাখা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া, পুরুষের চিতার উপরে জোর করে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা ধর্মের কী অপরূপ কীর্তি! পৃথিবীতে ধার্মিক লোকেরা যত নরহত্যা করেছে, কোন তৈমুরলং বা নাদির শাহ, তা করতে পারেনি।"

সৌম্যের সঙ্গে তর্ক করিয়া পারি না। নানা যুগের ইতিহাস লইয়া সৌম্য নূতন নূতন ব্যাখ্যা করে। তার সঙ্গে সব সময় একমত হইতে পারি না। কিন্তু তার কথা শুনিতে ভাল লাগে।

এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে কৃচিৎ রাজনীতি লইয়া আলোচনা হয়। সবাই আলোচনা করেন সাহিত্য লইয়া, শিল্পকলা লইয়া। দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে বিরাট পার্থক্য থাকিলেও পরস্পর মিশিতে কোন অসুবিধা হয় না। সৌম্যের আলোচনা দেশের রাজনীতি লইয়া। হিন্দু-মুসলমান কোন রাজনৈতিক নেতা তার কঠোর সমালোচনা হইতে বাদ যান না। কংগ্রেসের নেতা, হিন্দুমহাসভার নে, সমাজতন্ত্রী নেতা—এদের সৌম্য এমনই কঠোরভাবে সমালোচনা করে যে কোন গোঁড়া মুসলমান রাজনৈতিকের সমালোচনাও তার ধারকাছ দিয়া যাইতে পারে না। মুসলিম নেতারা অনেক সময় হিন্দু নেতাদের গাল দেন কোন রকমের যুক্তি না দেখাইয়াই। হিন্দু নেতারাও মুসলিম নেতাদের সেই ভাবে গাল দেন। যুক্তির বহর কোন দলেই ততটা শক্ত হয় না, কিন্তু সৌম্য এদের দুই দলকেই গাল দেয় যুক্তির অবতারণা করিয়া। সেইজন্য সৌম্যের সমালোচনায় হল থাকিলেও তাহাতে বিষ মেশানো থাকিত না।

দুই দলকে সমান ভাবে সে গাল পাড়িল। হিন্দু নেতাদের গাল দিতে সে যেসব যুক্তির অবতারণা করিত, তাহা শুনিয়া মাঝে মাঝে আনন্দ পাইতাম। কারণ, তাঁদের সকলকে আমি সমর্থন করিতাম না। আবার যেসব মুসলিম নেতাকে আমি সমর্থন করিতাম, তাদের বিরুদ্ধে সে কিছু বলিলে প্রাণপণে তার যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করিতাম, হারিয়া গিয়া কিছুটা ব্যথা পাইতাম।

সৌম্য বলিত, “আস্তে আস্তে দেশ থেকে ধর্মে ধর্মে ভেদ উঠে যাবে। ধর্মের ভেদ জিইয়ে রেখেই দেশের নেতারা সমাজতন্ত্রের প্লাবন দাঁড়াতে দিচ্ছে না। এই যে মানুষে প্রভেদ—একদল ফেলে ছড়িয়ে খাচ্ছে, আর একদল না খেয়ে মরছে—এই অসাম্য দেশ থেকে

কখনো যাবে না যদি ধর্মের লড়াই এমনি ভাবে চলতে থাকে। দেখছ না—এই যে তোমাদের মুসলানদের শক্তির লড়াই, এ শক্তি কার অন্য? মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুবিধাবাদীর জন্য। দেশের না-খাওয়া ভুখা জনগণের জন্য নয়। আর হিন্দুরা যে তোমাদের বাধা দেয়, তা-ও সেই বনিয়াদি কয়েক ঘর ধনীর স্বার্থ নষ্ট হবে বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলিম দলের ভুখা জনগণ বুঝতে পারে না, হিন্দুদলের সর্বহারারাও তা বোকে না। দুই সমাজের ধনিক লোকেরা নিজ নিজ সমাজের শ্রমিক লোকদের একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেয়। কত জীবন নষ্ট হয়। বড়লোকেরা কিন্তু ঠিকই থাকে। সেই জন্যে আমরা চাই, দেশের জনগণ ধর্ম সমাজ সব-কিছু ভুলে রুটির লড়াইয়ে নেমে আসুক।”

আমি বলি, “তোমার রুটির লড়াইয়ে আজ যারা তোমার সঙ্গে, ‘তাদের সংখ্যা হাতের আঙুলে গণা যায়। মনে কর, আমরা একদল মুসলিম তোমার সঙ্গে এসে যোগ দিলাম; ধর্মের কোন ধার ধারলাম না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান, দুই সমাজেই ত সাম্প্রদায়িক লোকেরা একে অপরের বাড়ি আগুন ধরাবে। যেহেতু আমরা কয়েকজন তোমার সঙ্গে রুটির লড়াই করছি, এ জন্যে কি হিন্দু সাম্প্রদায়িকবাদী আমাদের বাদ দেবে? আমাদের ঘর যখন পুড়বে, তখন আমাদের রক্ষা করবে কে? তোমার সমাজতন্ত্রবাদ যখন আসবে, মেনে নিলাম, সেদিন কোন সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই কারো কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু যতদিন সমাজতন্ত্রবাদ না আসে, ততদিন আমাদের রক্ষা করবে কে?”

সৌম্য বলে, “তবে কি তুমি দেশকে এই ভাবেই চলতে দিতে চাও? দুই দলের সুবিধাবাদী কয়েকজন সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালিয়ে রেখে সমস্ত দেশকে এইভাবেই শোষণ করে যাবে?

তর্কের উপর তর্ক চলিতে থাকে। কোন কোন রাতে আকাশে শুকতারা আসিয়া উদয় হয়।

সৌম্যের কাগজ গণবাণীতে আমি মহাত্মা গান্ধীকে সমালোচনা করিয়া বেনামীতে একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এতেই বোঝা যাইবে, সৌম্যের মতবাদ তখন কতটা প্রভাবিত করিয়াছিল। মোপল-বিদ্রোহের উপর সৌম্য একখানা বই লিখিয়াছিল, সেই বিদ্রোহ সম্পর্কে মতভেদ হইয়া আলী-ভ্রাতারা মহাত্মা গান্ধীর দল হইতে বাহির হইয়া যান। সৌম্য তার ছোট্ট বইখানায় যুক্তি এবং তথ্যসহ প্রমাণ করিয়াছিল, মোপলা-বিদ্রোহ বনিয়াদি ধনিকদের বিরুদ্ধে দেশের জনগণের স্বতস্ফুর্ত ফরিয়াদ।

তৎকালীন কংগ্রেস-নেতা কিদোয়াই এবং আরও অনেকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া সৌম্য দেখাইয়াছিল, মোপল-বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া মহাত্মা গান্ধী ভুল করিয়াছিলেন। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে, তখনকার দিনের সব চাইতে অধিক মুসলিম স্বার্থরক্ষাকারী স্যার নাজিমুদ্দীন সেই পুস্তকখানা গভর্নমেন্টের তরফ হইতে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

১৩.

নানা রকম রাজনৈতিক সমস্যার মাঝে মাঝে সৌম্য সাহিত্য লইয়াও আলোচনা করিত। তাহার বিচিত্র ভ্রমণ-কাহিনীর কথা বলিত। একবার অসুস্থ অবস্থায় লেনিন একটি

পাড়াগাঁয়ে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তিনি ত কোন রকম ধর্মই মানিতেন না; বড়দিনের উৎসবের সময় পাড়ার ছেলেরা লেনিনকে আসিয়া ধরিল, আমরা এখানে ক্রিসমাস-ট্রি লাগাইয়া উৎসব করিব। লেনিন অতি আগ্রহের সঙ্গে সেই উৎসবে যোগ দিলেন। তিনি রাজনৈতিক কার্যে বহুলভাবে ব্যস্ত থাকিতেন; কিন্তু প্রত্যেক বড়দিনের ছুটিতে সেই গ্রামের শিশুবন্ধুদের জন্য তিনি ক্রিসমাস-উপহার পাঠাইতেন।

এরূপ বহু রকমের গল্প সৌম্যের নিকট শুনিতাম। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার অধ্যাপক ডাঃ ভাক্সনারের সঙ্গে সৌম্য আমায় পরিচয় করাইয়া দেয়। তিনি জার্মানীর এক মাসিকপত্রে আমার নক্সী-কাঁথার মাঠ পুস্তকের সমালোচনা করেন। সৌম্য সবাইকে গালাগাল দিত, সমালোচনা করিত, দেশের সাহিত্যিক ধর্মনেতা রাষ্ট্র নেতা কাহাকেও বাদ দিত না। কিন্তু এক জনের প্রতি তার মনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক—এগুলির উপরে তার কথকতা শুনিতে প্রাণ জুড়াইয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথেরও সৌম্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং মমতা ছিল। সৌম্য সেবার ইউরোপে। আমি রবীন্দ্রনাথের সামনে বসিয়া আছি। হঠাৎ খবর আসিল, হিটলারকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে একজন বাঙালী যুবক ধরা পড়িয়াছে— সে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ খবরটি শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, সৌম্যের মধ্যে যে প্রদীপ্যমান বহ্নি দেখে এসেছি, তাতে সে যে এই ষড়মন্ত্রে লিপ্ত হবে সে বিষয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।” তিনি বহুক্ষণ সৌম্যের নানা গুণের প্রংশসা করিতে লাগিলেন।

সৌম্য প্রায়ই অসুস্থ থাকিত। দুরারোগ্য তার যক্ষ্মারোগ তার দেহকে মাঝে মাঝে একেবারে নিস্তেজ করিয়া তুলিত, কিন্তু দেশের সর্বহারা জনগণের জন্য তার মনের দাবদাহন এতটুকুও ম্লান হইত না। তার মা-বোন-ভাই আত্মীয়স্বজন সকলেই বড় শঙ্কিত ছিলেন—কোন সময়ে সৌম্যকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়া জেলে আটক করিয়া রাখে। জেলে গেলে এই অসুস্থ শরীর তার ভালমত যত্ন লইবার কেহ থাকিবে না, ভালমত চিকিৎসাও হইবে না।

আগেই বলিয়াছি, অজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিচের তলায় কয়টি ঘর ভাড়া লইয়া আমি এক সময়ে ঠাকুরবাড়িতে থাকিতাম। একদিন আমার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় মোহনলাল আসিয়া আমাকে বলিল, অলক-মামার এক বন্ধু পুলিশের বড় অফিসার; অফিসার তাকে গোপনে বলিয়াছেন, জসীমউদ্দীন আমাদের মাইনে-করা লোক; সৌম্য ঠাকুরের বিষয়ে সবকিছু জানার জন্য আমরা তাকে নিয়োগ করেছি। এই খবর বাড়ির সবার মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার করেছে। সৌম্যের মা-বোন খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অতএব তুমি এখানকার পাততাড়ি গুটাও।”

শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলাম। সৌম্যের মাবোন ছোট ভাগ্নেভাগ্নিরা আমাকে কতই স্নেহের চক্ষে দেখেন। এদের কাছে আমি কেমন করিয়া প্রমাণ করিব, আমি সি. আই. ডি. নই, পুলিশের কোন লোক নই। নিজেরই মনের জানার তাগিদে আমি সৌম্যের সঙ্গে মিতালী করিতে গিয়াছিলাম। এ বাড়ির সব কিছু আকাশ-বাতাস, মাটি-পাথর, সবাই যেন আমাকে আজ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। এ অপবাদ হইতে আমি নিজেকে কেমন করিয়া মুক্ত করিব?

যবনিকার অন্তরালে মোহনলাল নিশ্চয়ই আমার হইয়া অনেক লড়াই করিয়াছে। সুতরাং তার সঙ্গে এ আলোচনা করা বৃথা। রান্নাঘরের হাঁড়িতে ভাতগুলি অর্ধসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল; সেগুলি পাশের ড্রেনে ফেলিয়া দিলাম। একদল কাক আসিয়া একটা পথচারী কুকুরের সঙ্গে কামড়াকামড়ি লাগাইল। নিজের বই-পুস্তক বিছানা-বালিশ গুছাইতে গুছাইতে শরীর অবশ হইয়া আসিতে চায়। মোহনলাল বাড়ির খিড়কি-দরজায় একখানা রিক্সা ডাকিয়া আনিল। সে হয়ত বুঝিয়াছিল, আজ বাড়ির সদর-দরজা দিয়া চলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে কতখানি অসহ্য হইবে।

সমস্ত কিছু রিক্সার উপর উঠাইয়া দিয়া ক্ষণেকের জন্য সৌম্যের ঘরে বিদায় লইতে আসিলাম। সৌভাগ্যের কথা, সেখানে আর কেউ ছিল না। সৌম্য বলিল, "আমি সবই শুনেছি। পুলিশের লোকেরা অনেক সময় এই ভাবে মিথ্যে কথা রটিয়ে আমাদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদ করতে চায়। এটাও ওদের এক রকমের কৌশল। তবে বাড়ির লোকে এ বিষয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন। তুমি আপাতত এখান হতে চলে যাও।"

সৌম্যের আড্ডায় আমার যাওয়া বন্ধ হইল, কিন্তু অবনঠাকুরের দরজা আমার জন্য আগের মতই খোলা রহিল। কারণ সে বাড়িতে কোন রাজনীতি ছিল না।

ইহার পরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়াঢাকা চলিয়া আসিলাম। ছুটির সময়ে কলিকাতা গিয়, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতাম। সেবার গিয়া দেখিলাম, তিনি একাকী বসিয়া আছেন।

বহুদিন আগে তিনি রামায়ণের কাহিনীর উপর একখানা মাত্রাগানের বই লিখিয়াছিলেন। তাহারই পাণ্ডুলিপির উপর ঝুকিয়া পড়িয়া কি যেন হিজিবিজি লিখিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বড়ই খুশী হইলেন। বলিলেন, “সামনের টুলটা টেনে নিয়ে বস।”

টুলের উপর বসিয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, “দাদামশাই, কেমন আছেন?”

ম্লান হাসিয়া বলিলেন, “ভালই আছি। আগে ভাল ছিলাম না। আমার ছেলে মেম বিয়ে করে ফিরছে। কত আশা ছিল মনে! ওদের ছেলেমেয়ে হবে—আমার কাছে গল্প শুনবে, ছড়া শুনবে; আমার বৃদ্ধ বয়সের নির্জন দিনগুলোকে মুখর করে তুলবে। কিন্তু মেম সাহেবের ছেলেমেয়েরা ত আমাকে বুঝবে না। তাই মন বড় খারাপ ছিল। এখন ভেবে দেখলাম, আমি নিমিত্তমাত্র। আমার পেছনে একজন কর্তা আছেন। তার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে।”

ইহা বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস লইলেন। এত দিন এভাবে তার সঙ্গে মিশিয়াছি। কোন দিনই তাকে আমার কাছে এমন ভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিতে দেখি নাই। কথার মোেড় অন্যদিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “দাদামশাই, এখন কি আঁকছেন?

দাদামশাই বলিলেন, “বিশেষ কিছুই না। ছবি-আঁক। আসছে, কী করে সময় কাটাই? তোমরাও দূরে চলে গেছ। সেই পুরানো যাত্রাগানের পালাটি সামনে নিয়ে বসে আছি। এটা যে এমন কিছু হয়েছে, তা মনে করি না। কিন্তু সময় কাটাবার একটা অবলম্বন খুঁজে নিতে হয়।”

এই বলিয়া তার যাত্রাগানের সংশোধনে মন দিলেন। সেই আগের লেখা পাণ্ডুলিপির পাতাগুলির ধারে ধারে ছোট ঘোট করিয়া অক্ষর বসাইয়া যাইতেছেন। এত ছোট অক্ষর যে পড়া যায় কি যায় না। পাতার দুই পাশে যেন কতকগুলি বর্ণমালার মৌচাক সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সামনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে আমার দুইটি নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইতে চাহিল।

মহাভারতের রঙ-রেখার এই সার্থক উত্তরাধিকারীর শেষ জীবন কি নির্মম দুঃসহ একাকী হইয়া চলিয়াছে। রূপে, রঙে, রেখায় সারাজীবনের তপস্যা দিয়া যে মহামনীষী যুগযুগান্তরের ব্যথাতুরদের জন্য চিরকালের সান্ত্বনা রচনা করিয়াছেন, আজ জীবনের সায়াহ্নকালে তার জন্য কেহ এতটুকু সান্ত্বনা-বারি বহন করিয়া আনিছে না। আমাদের পৃথিবী এমনি অকৃতজ্ঞ।

কিছুক্ষণ পরে তিনি তার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুনবে, কেমন হয়েছে আমার যাত্রা-গান?”

আমি বলিলাম, “নিশ্চয়ই শুনব দাদামশাই।”

খাতা খুলিয়া, যাত্রা-গানের অভিনেতাদের মত করিয়া পড়িয়া চলিলেন। মাঝে মাঝে জুড়ি ও কুশীলবগণের গান। তাহাও তিনি সুর করিয়া গাহিয়া শুনাইলেন। সারাটি বিকাল কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন আর অক্ষর চোখে পড়ে না, তখন যাত্রা-পাঠ বন্ধ হইল।

তার নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। তিনি একবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না, যাত্রা-গান আমার কেমন লাগিয়াছে। সত্য বলিতে কি—তিনি চাহিয়াছিলেন, আমারই মত একজন নীরব শ্রোতা। আমাকে শুনাইতে পারিয়াই তাঁর আনন। আমাকে শুনাইতে গিয়া তিনি যেন তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের সৃষ্টির গোপন কোঠাটিকে বিস্তার করিয়া দেখিলেন। এমনি নীরব শ্রোতা সৃষ্টিকার্যে বই সহায়ক। আমার মতামতের জন্যে তার কি আসে যায়? বই সরাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে তিনি অন্দরমহলের দিকে চলিলেন। তাঁর মুখে-চোখে যেন নূতন প্রশান্তি।

১৪.

একদিন গিয়া দেখি, অবনীন্দ্রনাথ অনেকগুলি খবরের কাগজ লইয়া কাঁচি দিয়া অতি সাবধানে ছবিগুলি কাটিয়া লইতেছেন। কত রকমারি বিজ্ঞাপনের ছবি—সেগুলি কাটিয়া কাটিয়া যাত্রার পাণ্ডুলিপির এখানে ওখানে আঠা দিয়া আটকাইয়া লইতেছেন। যেন বয়স্ক-শিশুর ছেলেখেলা। ছবিগুলির কোনটার মাথা কাটিয়া অপরটার মাথা আনিয়া সেখানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবিগুলি তাতে এক অদ্ভুত রূপ পাইয়াছে। তিনি বলিলেন, “আমার যাত্রার বই ইলাসট্রেট করছি।”

একবার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ায় তিনি মন দিলেন। কাগজে প্রতিদিন কত রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রকাশিত হয়, দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কত উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়, তিনি সেদিকে ফিরিয়াও তাকান না। খবরের কাগজ হইতে তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন, বুড়া লুকাইয়া হিমানী মাখিতেছেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, এই

ছবিটি তিনি তাঁর রামায়ণ-খাতার এক জায়গায় আঠা দিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অতি-আধুনিক কবিদের মধ্যে কেহ কেহ খবরের কাগজের এখান হইতে ওখান হইতে ইচ্ছামত কয়েকটি লাইন একত্র সমাবেশ করিয়া কোন নূতন রকমের ভাব প্রকাশ হয় কি না তার পরীক্ষা করেন। তেমনি তিনিও এই ভাবে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি লইয়া কোন একটা বিশেষ সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। তার যাত্রা-গানের খাতাখানা আবার দেখিতে পাইলে সে বিষয়ে বিশদ করিয়া বলিতে পারিতাম।

একদিন গিয়া দেখি, রাশি রাশি খবরের কাগজ-আনন্দবাজার, যুগান্তর ইত্যাদি লইয়া তিনি মসগুল হইয়া পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া সহাস্যে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে জসীমিঞা, দেখ, দেখ, কেমন সুন্দর বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে : সুন্দরী কন্যা, গৌরবর্ণ, এম. এ. পড়ে। তার জন্য পাত্র চাই। আর একটা দেখ : মেয়ের বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম; পিতা ধনী ব্যক্তি; ভাল পাত্র পাইলে বিলাত যাওয়ার খরচ দেওয়া হইবে।-কেমন, বিয়ে করবে?"

এমনি খবরের কাগজ লইয়া তিনি খেলা করিতেন। তাঁকে কোনদিনও গুরুগম্ভীর হইতে দেখি নাই। তিনি যে ছবি আঁকিতেন, তাতেও যেন খেলা করিতেন। কখনো কখনো নিজের বাগান হইতে একটুখানি মাটি আনিয়া কিংবা একটি গাছের পাতা আনিয়া ছবির এক জায়গায় ঘলিয়া দিতেন খুব অস্পষ্ট করিয়া, একেবারেই চোখে মালুম হয় না। এমনি করিয়া ছবির উপরে সারাটি সকাল ধরিয়া রঙ ঘসিয়া দুপুরবেলা তাহা পানির মধ্যে ডুবাইয়া লইতেন। সমস্ত – ফ্যাকাশে হইয়া যাইত। ছবিখানা শুকাইলে তাহার উপর আবার নতুন করিয়া রঙ পরাইতেন। অতি সূক্ষ্মভাবে ছবিতে রঙ লাগাইতে তার বড়

আনন্দ। কাছের আকাশে দু-একটি রেখায় পাখি উড়াইয়া, আকাশটিকে দূরে সরাইয়া দিতেন। দূরের গ্রামখানায় দু-একটি গাছ আঁকিয়া তাকে নিকটের করিয়া লইতেন। রঙের যাদুকর রঙের আর রেখার কৌশলে যা-কিছু নিকটের ও দূরের সমস্ত চোখের চাউনির জগতে টানিয়া আনিতেন।

ঠাকুরবাড়ির সুপরিসর বারান্দার উপর বসিয়া রঙ লইয়া এই বয়স্ক-শিশুরা অপরূপ খেলা খেলিতেন। যে বিরাট জমিদারীর আয় হইতে ঠাকুরবাড়ির এই মহীরূহ বর্ধিত হইয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহার পত্বপুষ্প খসিয়া পড়িতেছিল। অপরিসীম দানে ও জমিদারীকার্য তদারকের অক্ষমতায় সেই মহাতরু মাটির যে গভীরতা হইতে রস সংগ্রহ করিত, তাহা ধীরে ধীরে শুখাইয়া আসিল। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের শৈশব-যৌবন বার্ধক্যের লীলা-নিকেতন ঠাকুরবাড়ি নিলামে বিক্রী হইয়া ধনী মাড়োয়ারীর হস্তগত হইল। যাহারা মানুষের জীবনে রূপ দিয়াছিলেন, কথাকাহিনীর সরিৎসাগর খনন করিয়া দেশের জনগণকে পুণ্যস্নান করাইয়াছিলেন, আজ কেহই আসিয়া তাহাদের পিছনে দাঁড়াইল না। কত দরিদ্র সাহিত্যিক, অখ্যাত শিল্পী, প্রত্যাখ্যাত গুণী ভঁহাদের দুয়ারে আসিয়া ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইত। দিতে দিতে তারা সর্বস্ব দিয়া প্রায় পথের ভিখারী হইলেন। যাদের কীর্তিকাহিনী সাগর পার হইয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দেশের নামে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া আসিত, তাদেরই দানে দেশ আজ বড় হইয়া তাদের দিকে ফিরিয়া ও তাকাইল না। রাজপুত্রের পথের ভিখারী হইলেন। বিরাট ঠাকুর-পরিবার শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া কলিকাতার অজ্ঞাত অখ্যাত অলিতে গলিতে ছড়াইয়া পড়িল।

বরানগরের এক বাগানবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ উঠিয়া আসিলেন। তার আগেই আমি কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকা চলিয়া আসিয়াছি।

সেবার কলিকাতা গিয়া বরানগরের বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করিলাম। কোন নূতন লেখা পড়িয়া শুনাইলে তিনি খুশী হইতেন। সেইজন্য আমার 'বেদের মেয়ে নাটকের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি তখন দুরারোগ্য শ্বাসরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

বারান্দায় বসিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর সেই দক্ষিণের বারান্দা আজ আর নাই। বলিলাম, "কথা বলতে আপনার কষ্ট হবে। আমার 'বেদের মেয়ে নামক নাটকের পাণ্ডুলিপি এনেছি, যদি অনুমতি করেন, পড়ে শুনাই।"

তিনি বিশেষ কোন উৎসুক্য দেখাইলেন না। সস্নেহে হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "বস।"

সামনে গিয়া বসিলাম। দুই চোখ পানিতে ভরিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। সেই রূপকথা বলার কহকুণ্ডপাখি বাহীন। ছবির পরে ছবি মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেই প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে যতগুলি দিন এই মহান সৃষ্টিকারের সঙ্গে কাটাইয়াছি, কত হাসি, কত কাহিনী।—সব আজ চিরজনমের মত ফুরাইয়া যাইতেছে।

তিনি বলিলেন, "রাতে ঘুমোতে পারিনে। বড় কষ্ট পাচ্ছি।"

আমি বলিলাম, "শুনেছি, আমেরিকায় কি রকমের যন্ত্র আছে। গলায় লাগালে শ্বাসকষ্টের অনেক লাঘব হয়।"

বলিলেন, "কে এনে দেবে সেই যন্ত্র?"

ভাবিয়া দুঃখ হইল, দেশে বিদেশে তার এত গুণগ্রাহী, এত আত্মীয়স্বজন—তাকে রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিতে কাহারো কী মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে না? হয়ত তাদের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে তারাও রোগযন্ত্রণা-লাঘবের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন। আমারই ভাবিবার ভুল। আমার ভুল যেন সত্য হয়।

বলিলাম, “দাদামশায়, আপনাকে আমি যেমন দেখেছি, সমস্ত আমি বড় করে লিখব।”

এত যে শরীর খারাপ, তখনও সেই চিরকালের রসিকতা করিয়া কথা বলার অভ্যাস তিনি ভোলেন নাই। একটু হাসিয়া বলিলেন, “তোমার যা খুশী লিখে দিও। লিখে দিও, অবনঠাকুরকে আমি ছবি আঁকা শিখিয়েছি। কাগজে বের করে দাও। আমি বলব, সব সত্যি।”

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, নির্জন বরানগরে তিনি আরও একাকী। সঙ্গ দেবার কেহ নাই। মোহনলাল চলিয়া যায় অফিসে। ছেলে অলকবাবু ব্যবসায়ে কিছু উপার্জন করিতে এখানে-ওখানে ছুটিয়া বেড়ান। ছোট দুইটি নাতি-বাদশা বীরু, তারা থাকে শান্তিনিকেতনে। স্ত্রী বহুদিন গত হইয়াছেন। পুত্রবধূকে সাংসারিক নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়। শ্বশুরকে দেখিবার শুনিবার কতটুকুই বা অবসর পান তিনি। নির্জন বরানগরের বাড়িতে একাকী শিল্পকার দারুণ ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন। ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে তাকে কেহ মুক্ত করিতে পারিবে না—কিন্তু এই দুঃসময়ে কেহ যদি নিকটে থাকিয়ার যন্ত্রণায় সমব্যথী হইয়া কাছে কাছে থাকিত, তবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করা তাঁর পক্ষে রাখার মত কতই সহজ হইত।

দুই হাতে পায়ের ধূলি লইয়া সালাম করিয়া বিদায় লইলাম। আমার হাত দুইটি শিথিল হাতে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “মনে রেখো। তোমাদের কালে আমরা থাকব না। অনেক কিছু মনে পাবে। সেই সঙ্গে আমাকেও মনে রেখো।”

বলিলাম, “আমি একা কেন মনে রাখব দাদামশাই, আমার দেশের শত শত লোক আপনাকে মনে রাখবে।”

তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। রোগ-যন্ত্রণায় হাঁপাইতে লাগাইলেন। নীরবে অনেকক্ষণ পঁড়াইয়া রহিলাম। বহুকষ্টে নিজের দুই চোখের অশ্রুধারাকে সংযত করিতেছিলাম। মনে মনে কেবলই প্রার্থনার ধ্বনি জাগিতেছিল—হে অস্তাচল-পথযাত্রীতোমাকে জানাই আমার শেষ সালাম। তোমার তুলির রেখায় ও রঙে নতুন করিয়া জীবন পাইয়াছিল মহাভারতের সেই বিস্মৃতপ্রায় মহামহিমা। ইলোরা-অজন্তার প্রস্তর-গাত্রে পুরীর মন্দির-চত্বরে কাহিনী যুগ-যুগান্তর ঘুমাইয়াছিল, তুমি তাহাকে নূতন করিয়া আবার তোমার দেশবাসীর উপভোগের সামগ্রী করিলে। যদি দেশে সত্যকার একজনও দেশপ্রেমিক জন্ম গ্রহণ করে, তোমার কাহিনী সে অমর অক্ষরে লিখিয়া রাখিবে। অমনি স্নেহ-মমতা আর রঙের রেখার মাধুরী বিস্তার করিয়া তুমি অপেক্ষা করিও সেই চির-অজানা তুহিন রহস্যময় দেশে। আমরাও একদিন গিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইব।

বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় ফিরিয়া ফিরিয়া সেই স্নেহময় মুর্তিখানি দেখিলাম। সেই দেখাই যে শেষ দেখা হইবে, তাহা সেদিন বুঝিতে পারি নাই। আজ তাঁহার কথা ভাবিতে কেবলই মনে হইতেছে, দূরে বহুদূরে কোন করুণ

গোধূলি-আলোকের তলে এক পথশ্রান্ত উট পিঠের বোঝার ভারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছে বালুকার উপরে। দূরের আকাশ কান্নায় করুণ হইয়া আছে ওপারের রঙিন ম্লান রশ্মির উপর। তাঁর নিজের হাতে আঁকা সেই 'বোঝা' ছবিটির মতন তিনিও বুঝি সেখানে লুটাইয়া পড়িয়াছেন।

১৫.

আমি ঢাকা চলিয়া আসিলাম দেশ-বিভাগের পরে। অবনীন্দ্রনাথের জমিদারী সংক্রান্ত বহু কাজ আমাদের পূর্ব-পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট-ভবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। অবনবাবু বড় ছেলে অলকবাবু আমাকে সেই বিষয়ে খবরাখবর লইতে প্রায়ই পত্র লিখিতেন। আমিও তাহার ত্বরিৎ জবাব দিতাম।

একদিন সকালে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া প্রায় তিনটার সময়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেখি, গবদা আমার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আমার স্ত্রী পরিচয় পাইয়া আগেই তাহাকে কিছু নাস্তা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শুনিলাম, গবাদা ঢাকা আসিয়াছেন রাত একটায়। সারারাত্রি স্টেশনে কাটাইয়া সকালে আমার খোঁজে বাহির হইয়াছেন। স্বাধীনতার পর ঢাকায় কত নতুন নতুন সোক আসিয়াছে। কে কাহার সন্ধান রাখে! প্রায় সারাদিন ঘুরিয়া তিনি আমার বাসার খোঁজ পাইয়াছেন। এত বেলা পর্যন্ত এক কাপ চা-ও অন্য কোথাও পান করেন নাই। শুনিয়া আমার দুইচোখে পানি বাহির হইবার উপক্রম হইল। সেই ব্বতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আহারবিহারে কত বিলাসের মধ্যে মানুষ! রাত্রি একটার সময় হইতে পরদিন বেলা তিনটা পর্যন্ত অভুক্ত অনিদ্রায় ঘুরিয়া আমার বাসা খুঁজিয়াছেন। ঢাকায় কত

হোটেল, ভাল ভাল থাকিবার জায়গা। তাহা সত্ত্বেও কতখানি অসুবিধা থাকিলে ঠাকুর পরিবারের ছেলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার বাসার সন্ধান করেন। ভাবিয়া নিজের উপরে ধিক্কার আসিল। কেন এমন হইল! দেশে আজ এমন কেহ নাই যে এই পরিবারের বিরাট দানের এতটুকুও আজ পরিশোধ করিতে পারে।

আমার স্ত্রীকে গিয়া বলিলাম, "দেখ, রাজপুত্র আজ আমাদের অতিথি। তোমার যতটুকু আদর-আপ্যায়নের ক্ষমতা আর রন্ধনবিদ্যা আছে, জাহির কর।"

দুই বন্ধুতে মিলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ,—আমাদের বিগত জীবনের নানা ঘটনার পুনরাবৃত্তি। স্নেহময় অবনঠাকুর আজ পরলোকগত। তাঁর জীবনের ঘটনাগুলিকে অতীতের গহন অন্ধকার হইতে টানিয়া আনিয়া দুই বন্ধু সামনে মেলিয়া ধরিলাম। বায়স্কোপের চিত্রগুলির মত তারা একে অপরের হাত ধরাধরি করিয়া উপস্থিত হয়। সকাল কাটে, সন্ধ্যা কাটে। রাতও বুঝি ভোর হইবার জন্য ঢুলুঢুলু আঁখি। কিন্তু আমাদের বিরাম নাই। দুপুরে রেভেনিউ-বিভাগের সম্পাদক ফজলুল করিম সাহেবের সঙ্গে গবাদার বিষয় সংক্রান্ত আলাপ হইল। তিনি অতিশয় অমায়িক ব্যক্তি। গবাদার যা-কিছু কাজ তিনি করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

দুই-তিন দিন গবাদা আমাদের এখানে ছিলেন। যে মানুষটি সব সময় পরের কাজ করিয়া বেড়াইতেন, আজ তিনি নিজের জন্য কাজ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। বোম্বেতে সিনেমা-লাইনে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। তারপর দেশে ফিরিয়া একেবারে বেকার। বন্ধুকে পরামর্শ দিই, "আপনি এখানে চলে আসুন। নতুন করে এখানে নাটক সৃষ্টি করি—আর্ট সৃষ্টি করি।"

গবাদা রাজী হইয়া যান। তার পর চলে দুই জনে নানা পরিকল্পনা।

জানি যে, রাত্রি ভোর হইলে এই পাখি তার ক্ষণিকের নীড় ছাড়িয়া সুদূর আকাশে পাড়ি দিবে। তবু যারা কল্পনাবিলাসী, তাদের রাত্রি কল্পনার পাখা বিস্তার করিয়াই ভোর হয়। কয়েকদিন থাকিয়া গবাদা চলিয়া গেলেন। তাঁকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আমার-লেখা "যাদের দেখেছি" বইখানা পথে পড়িবার জন্য উপহার দিলাম। এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কাহিনী লেখা আছে। তাতে অবনঠাকুরের বাড়ির অনেকের কথা আছে।

বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ পাইয়া সেবার কলিকাত গেলাম। গিয়া উঠিলাম সুজনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। সুজন সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি। অবনঠাকুরের বাড়ি নিলামে বিক্রী হওয়ার পরে তাঁরা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির নিচের তলায় দুইখানা ঘর লইয়া কোন রকমে বসবাস করিতেছেন। সেই অল্প-পরিসর জায়গায় তাঁদেরই স্থান-সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু তবু কতই না আদর করিয়া তাঁহারা আমাকে গ্রহণ করিলেন।

আজ ঠাকুরবাড়ির সেই ইন্দ্রপুরী শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সে লোক নাই; সে জাঁকজমক নাই। বাড়িখানি ভাঙিয়া চুরিয়া রবীন্দ্রভারতীর জন্য নতুন নক্সায় ইমারৎ তৈরী হইয়াছে। সেই গাড়ীবারান্দা, সেই হল-ঘরগুলি, সেই উপরে সিঁড়ি, সেই দক্ষিণদুয়ারী বারান্দা—যেখানে বসিয়া দাদামশাই ও তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ শিল্পসাধনা কবিতেন, নির্মম বর্তমান তার কোন চিহ্ন রাখে নাই। শুনিয়াছি শেক্সপীয়ারের অতি-পুরাতন বাড়িখানি যেমনটি ছিল, তেমনি করিয়া সংরক্ষিত হইয়াছে। আজ অবনীন্দ্রনাথ-

গগনেন্দ্রনাথের বাড়িটি কি সেই ভাবে রক্ষিত করা যাইত না? দেশের জন্য বক্তৃতা করিয়া যাহারা গোলদীঘি-লালদীঘিতে আলোড়ন তুলিতেন, দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা কি শুধু তাদেরই জন্য? মহাভারতের মর্মকথা শুনাইবার জন্য যাহাদিগকে আমরা শ্রেষ্ঠ আসন দিই, তারা কি কারো চাইতে কম ছিলেন?

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যাঁরা সর্বভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান ঢুড়িয়া দেশবাসীর জন্য গৌরবের ইন্দ্রসভা রচনা করিয়াছেন, যাদের তুলির স্পর্শে জনগণ মহান দেশকে অনুভব করিতে শিখিয়াছে, তাদের প্রতি কি কারো কৃতজ্ঞতা নাই।

সুজন কিছুই উপার্জন করে না। সে বিনা বেতনে কোথায় কোথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখাইয়া সময় কাটায়। ছোট ভাই কোন অফিসে সামান্য কিছু উপার্জন করে, তাই দিয়া অতি কষ্টে তাদের দিন চলে। সমর ঠাকুরের আদরের পুত্রবধু সুজনের মা পরিবারের কত বিলাস-উপকরণের মধ্যে লালিত-পলিত। আজ পরনে তাঁর শতছিন্ন বস্ত্র। ঘরের আসবাবপত্রের দৈন্য যেন আমাকে শত বৃশ্চিকদহনে দগ্ধ করিতেছিল।

উপরে থাকেন সৌম্যের মা। কত আদর করিয়া চা খাইতে ডাকিলেন। চা খাইতে খাইতে কথা বলি। নানা কথার অবতারণা করিতে অতীত আসিয়া পড়ে। অতীত কথা আসিতে শোকের কথা আসিয়া পড়ে। ঐ শোক-সন্তপ্ত পরিবারে নিজের অজ্ঞাতে তাদের সঞ্চিত দুঃখকে আরও বাড়াইয়া দিয়া আসি।

নীচে সুজনের মা–উপরে সৌম্যের মা—এ-বাড়ির বধূ ও-বাড়ির বধুতে কথা কওয়া-কওয়ি হয়, একের কাহিনী অপরের কাছে বলিয়া জ্বালাইয়া রাখে সেই অতীত যুগের কথা সরিৎসাগরের কাহিনী।

প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, মহানাটকের চরিত্রগুলি আজ একে একে বিদায় লইতেছেন। এ কাহিনী আর দীর্ঘ করিব না। যে নিয়োগব্যথা আমার অন্তরের অন্তস্তলে মোহময় কান্নার বাঁশী বাজাইয়া সেই অতীত কাল হইতে ছবির পর ছবি আনিয়া আমার মানসপটে দাড় করায়, তাহা আমারই নিজস্ব হইয়া থাকুক। লোকালয়ে টানিয়া আনিয়া আর তাহা স্নান করিব না।

# নজরুল

পদ্মানদীর তীরে আমাদের বাড়ি। সেই নদীর তীরে বসিয়া নানা রকমের কবিতা লিখিতাম, গান লিখিতাম, গল্প লিখিতাম। বন্ধুরা কেউ সে সব শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কেউ-বা সামান্য তারিফ করিতেন। মনে মনে ভাবিতাম, একবার কলিকাতায় যদি যাইতে পারি, সেখানকার রসিক-সমাজ আমার আদর করিবেনই। কতদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, কলিকাতার মোটা মোটা সাহিত্যিক দের সামনে আমি কবিতা পড়িতেছি। তাহারা খুশি হইয়া আমার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছেন। ঘুম হইতে জাগিয়া ভাবিতাম, একটিবার কলিকাতা যাইতে পারিলেই হয়। সেখানে গেলেই শত শত লোক আমার কবিতার তারিফ করিবে। কিন্তু কি করিয়া কলিকাতা যাই। আমার পিতা সারা জীবন ইস্কুলের মাস্টারী করিতেন। ছেলেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে এইরূপ আকাশকুসুম চিন্তা করে, তিনি জানিতেন। কিছুতেই তাহাকে বুঝানো গেল না, আমি কলিকাতা গিয়া একটা বিশেষ সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করিতে পারি। আর বলিতে গেলে প্রথম প্রথম তিনি আমার কবিতা লেখার উপরে চটা ছিলেন। কারণ পড়াশুনার দিকে আমি বিশেষ মনোযোগ দিতাম না, কবিতা লিখিয়াই সময় কাটাইতাম। তাতে পরীক্ষার ফল সব সময়ে ভাল হইত না।

তখন আমি প্রবেশিকার নবম শ্রেণীতে কেবলমাত্র উঠিয়াছি। চারিদিকে অসহযোগ-আন্দলনের ধুম। ছেলেরা ইস্কুল-কলেজ ছাড়িয়া স্বাধীনতার আন্দোলনের নামিয়া পড়িতেছে। আমিও স্কুল ছাড়িয়া বহু কষ্ট করিয়া কলিকাতা উপস্থিত হইলাম।

আমার দূর সম্পর্কের এক বোন কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁর স্বামী কোন অফিসে দপ্তরীর চাকুরী করিয়া মাসে কুড়ি টাকা বেতন পাইতেন। সেই টাকা দিয়া অতি কষ্টে তিনি সংসার চালাইতেন। আমার এই বোনটিকে আমি কোনদিন দেখি নাই। কিন্তু অতি আদরের সঙ্গেই হাসিয়া তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। দেখিয়াই মনে হইল, যেন কত কালের স্নেহ আদর জমা হইয়া আছে আমার জন্য তাহার হৃদয়ে। বৈঠকখানা রোডের বস্তিতে খোলর ঘরের সামান স্থান লইয়া তাঁহাদের বাসা। ঘরে সঙ্কীর্ণ জায়গা, তার মধ্যে তাদের দুইজনের মতন চৌকিখানারই শুধু স্থান হইয়াছে। বারান্দায় দুই হাত পরিমিত একটি স্থান, সেই দুই হাত জায়গা আমার বোনের রান্নাঘর। এমনি সারি সারি সাত-আট ঘর লোক পাশাপাশি থাকিত। সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যেক ঘরে কয়লার চুলা হইতে যে ধূম বাহির হইত, তাহাতে ওইসব ঘরের অধিবাসীরা যে দম আটকাইয়া মরিয়া যাইত না— এই বড় আশ্চর্য মনে হইত। পুরুষেরা অবশ্য তখন বাহিরে খোলা বাতাসে গিয়া দম লইত, কিন্তু মেয়েরা ও ছোট ছোট বাচ্চাশিশুরা ধুয়ার মধ্যেই থাকিত। সমস্তগুলি ঘর লইয়া একটি পানির কল। সেই কলের পানিও স্বল্প-পরিমিত ছিল। সময়মত কেহ স্নান না করিলে সেই গরমের দিনে তাহাকে অস্নাত থাকিতে হইত। রাত্রে এঘরে-ওঘরে কাহারও ঘুম হইত না। আলো-বাতাস বঞ্চিত ঘরগুলির মধ্যে যে বিছানা-বালিস থাকিত, তাহা রৌদ্রে দেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। সেই অজুহাতে বিছানার আড়ালে রাজ্যের যত ছারপোকা অনায়াসে রাজত্ব করিত। রাত্রে একে তো গরম, তার উপর ছারপোকার উপদ্রব। কোন ঘরেই কেহ ঘুমাইতে পারি না। প্রত্যেক ঘর হইতে পাখার শব্দ আসিত, আর মাঝে মাঝে ছারপোকা মারার শব্দ শোনা যাইত। তা ছাড়া প্রত্যেক ঘরের মেয়েরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে পরদা মানিয়া চলিত, অর্থাৎ পুরুষেরাই যার যার ঘরে আসিয়া পর্দায় আবদ্ধ হইত। প্রত্যেক বারান্দায় একটি করিয়া চটের আবরণী। পুরুষলোক ঘরে

আসিলেই সেই আবরণী টাঙাইয়া দেওয়া হইত। দুপুরবেলা যখন পুরুষেরা অফিসের কাজে যাইত, তখন এঘরের ওঘরের মেয়েরা একত্র হইয়া গাল-গল্প করিত, হাসি-তামাসা করিত, কেহ-বা সিকা বুনিত, কেহ কাঁথা সেলাই করিত। তাদের সকলের হাতে রঙবেরঙের সূতাগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নক্সায় পরিণত হইত। পাশের ঘরের সুন্দর বউটি হাসিয়া হাসিয়া কখন ও বিবাহের গান করিত, বিনাইয়া বিনাইয়া মধুমালার কাহিনী বলিত। মনে হইত, আল্লার আসমান হইতে বুঝি এক ঝলক কবিতা ভুল করিয়া এখানে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

এ হেন স্থানে আমি অতিথি হইয়া আসিয়া জুটিলাম। আমার ভগ্নীপতিটি ছিলেন খাঁটি খোন্দকার বংশের। পোলাও-কোর্মা না খাইলে তাহার চলিত না। সুতরাং মাসের কুড়ি টাকা বেতন পাইয়া তিনি পাঁচটাকা ঘরভাড়া দিতেন। তারপর তিন-চার দিন ভাল গোস্ত-ঘি কিনিয়া পোলাও-মাংস খাইতেন। মাসের অবশিষ্ট কোন কোন দিন খাইতেন, কোন দিন বা অনাহারে থাকিতেন।

মাসের প্রথম দিকেই আমি আসিয়াছিলাম। চার-পাঁচ দিন পরে যখন পোলাও-গোস্ত খাওয়ার পর্ব শেষ হইল, আমার বোন অতি আদরের সঙ্গে আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সোনাভাই, আমাদের সংসারের খবর তুই জানিস না। এখন থেকে আমরা কোনদিন বা অনাহারে থাকব। আমাদের সঙ্গে থেকে তুই এত কষ্ট করবি কেন? তুই বাড়ি যা।"

আমি যে সঙ্কল্প লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি, তাহা সফল হয় নাই। কলিকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গে এখনও আমি পরিচিত হইতে পারি নাই। বোনকে বলিলাম,

"বুবুজান, আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাল থেকে আমি উপার্জন করতে আরম্ভ করব।"

বুবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবে উপার্জন করবি রে?"

আমি উত্তর করিলাম, "এখন তাহা আপনাকে বলব না। পরে জানাব।"

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া খববের কাগজের অপিসে ছুটিলাম। তখনকার দিনে 'বসুমতী' কাগজের চাহিদা ছিল সব চাইতে বেশী। কয়েকদিন আগে টাকা জমা দিলে হকাররা কাগজ পাইত না। নায়ক' কাগজের তত চাহিদা ছিল না। বসুমতী অপিসে চার-পাঁচ দিন আগে টাকা জমা দেওয়ার সঙ্গতি আমার ছিল না। সুতরাং পাঁচখানা নায়ক কিনিয়া বেচিতে বাহির হইলাম। রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া 'নায়ক, নায়ক' বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিলাম। সারাদিন ঘুরিয়া পঁচিশখানা নায়ক বিক্রয় করিয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন শ্রান্তিতে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে। পঁচিশখানা বিক্রয় করিয়া আমার চৌদ্দ পয়সা উপার্জন হইল। আমার পরিশ্রান্ত-দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বোন সস্নেহে বলিলেন, "তুই বাড়ি যা। এখানে এত কষ্ট করে উপার্জন করার কি প্রয়োজন? বাড়ি গিয়ে পড়াশুনা কর।"

কিন্তু এসব উপদেশ আমার কানে প্রবেশ করিল না। এইভাবে প্রতিদিন সকালে উঠিয়া খবরের-কাগজ বিক্রয় করিতে ছুটিতাম। রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাগজে বর্ণিত খবর গুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতাম। মাঝে মাঝে কাগজের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতাম। কলিকাতা

সহরে কৌতূহলী লোকের অভাব নাই। তাহারা ভীড় করিয়া জড়াইয়া আমার বক্তৃতা শুনিত। কিন্তু কাগজ কিনিত না।

কাগজ বিক্রয় করিতে করিতে কার্তিকদাদার সঙ্গে পরিচয় হইল। বিক্রমপুরের কোন গ্রামে তাহার বাড়ি। তিনিও খবরের কাগজ বিক্রয় করিতেন। কি ভাবে তাহার সঙ্গে আলাপ হইল, আজ সমস্ত মনে নাই। তবে এতটুকু মনে আছে, আমার অবিক্রীত কাগজগুলি কার্তিকদাদা বিক্রয় করিয়া দিতেন। আমারই মত অনেক হকারের এটা-ওটা কাজ তিনি করিয়া দিতেন। সেইজন্য আমরা সকলে তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতাম।

আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে কার্তিক দাদা থাকিতেন। আমার বোনের বাড়িতে থাকার অসুবিধার কথা শুনিয়া কার্তিক দাদা আমাকে তাহার বাসায় উঠিয়া আসিতে বলিলেন। আট আনায় একটি মাদুর কিনিয়া লইয়া কার্তিকদাদার বাসায় উপস্থিত হইলাম। এক ভাঙা বাড়ির দ্বিতল কক্ষ কার্তিকদাদা ভাড়া লইয়াছিলেন। কক্ষটির সামনে প্রকাণ্ড খোলা ছাদ ছিল। সেই ছাদেই আমরা অধিকাংশ সময় যাপন করিতাম। বৃষ্টি হইলে সকলে ছাদ হইতে মাদুর গুটাইয়া আনিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতাম।

সকাল হইলে যে যার মত খবরের কাগজ লইয়া বিক্রয় করিতে বাহির হইতাম। দেড়টা বাজিলে সকলে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। তারপর দুইটা তিনটার মধ্যে রান্না ও খাওয়া শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যাইতাম খবরের কাগজের আপিসে। তখনকার দিনে বাংলা কাগজগুলি বিকেলে বাহির হইত। রাত আটটা নয়টা পর্যন্ত কাগজ বিক্রয় করিয়া ‘সায় ফিরিয়া আসিতাম। তারপর রান্নাখাওয়াটা কোন রকমে সারিয়া ছাদের উপর মাদুর

বিছাইয়া তাহার উপর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটা ঢালিয়া দিতাম। আকাশে তারাগুলি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিত। তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িতাম। আকাশের তারাগুলি আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিত কিনা কে জানে?

কোন কোন রাত্রে মোমবাতি জ্বালাইয়া কার্তিকদাদা আমার কবিতাগুলি সকলকে পড়িয়া শুনাইতেন। আমার সেই বয়সের কবিতার কতটা মাধুর্য ছিল, আজ বলিতে পারিব না। সেই খাতাখানা হারাইয়া গিয়াছে। আর আমার শ্রোতারা সেই সব কবিতার রস কতটা উপলব্ধি করিত, তাহাও আমার ভাল করিয়া মনে নাই।

কিন্তু তাহাদেরই মত একজন হকার যেসব কাগজ তাহারা বিক্রয় করে সেই সব কাগজের লেখার মত করিয়া যে লিখিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিয়া তাহারা গর্ব অনুভব করিত। কার্তিকদাদা আই. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। নন-কোঅপারেশন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া খবরের কাগজ বিক্রয় পেশা হিসাবে লইয়াছেন। তিনি কট হামসুন ও ম্যক্সিম গোর্কীর জীবনী পড়িয়াছেন। আমাকে লইয়া তাঁহার গর্বের অন্ত ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দেখা হইলেই সগর্বে আমাকে কবি বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতেন।

আমাদের সংসারে ছিল দিন আনিয়া দিন খাওয়া। কেহই বেশী উপার্জন করিতে পারিত না। নন-কোঅপারেশন করিয়া আমাদের মতই বহু ভদ্রঘরের ছেলে খবরের কাগজ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং কাগজ বিক্রয় করার লোকের সংখ্যা ছিল অত্যধিক। সারা দিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করিয়াও আমাদের কেহ চার-পাঁচ আনার বেশী উপার্জন করিতে পারি না। আমি চৌদ্দ পয়সার বেশী কোন দিনই উপার্জন করিতে পারি



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নাই। মাঝে মাঝে শরীর খারাপ থাকিলে বেশী ঘুরিতে পারিতাম না, সুতরাং উপার্জনও হইত না। সেই দিনটার খরচ কার্তিকদাদা চালাইয়া দিতেন। পরে তাহার ধার শোধ করিতাম। কোন কোন দিন আমার সেই বোনের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইতাম।

একদিনের কথা মনে পড়ে। কাগজ বিক্রয় করিয়া মাত্র এক আনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি! দুই পয়সার চিড়া আর দুই পয়সার চিনি কিনিয়া ভাবিলাম, কোথায় বসিয়া খাই? দুপুরবেলা আমার সেই বোনের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বোন আমার শুষ্ক মুখ দেখিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি আমার হাত হইতে চিড়া আর চিনির ঠোঙা ফেলিয়া দিয়া আমাকে আদর করিয়া বসাইয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন।

আমি বলিলাম, "বুবু, আপনি তত খান নাই। আপনার ভাত আমি খাব না।"

বুবু বলিলেন, "আমায় আজ পেট ব্যাথা করছে। আমি খাব না। তুই এসে ভাল করলি। ভাতগুলি নষ্ট হবে না।"

আমি সরল মনে তাহাই বিশ্বাস করিয়া ভাতগুলি খাইয়া ফেলিলাম। তখন অল্প বয়সে তাঁহার এ স্নেহের ফাঁকি ধরিতে পারি নাই। এখন সেই সব কথা মনে করিয়া চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসে। হায় রে মিথ্যা! তবু যদি তাঁর মায়ের পেটের ভাই হইতাম! সাতজন্মে যাকে কোন দিন চোখে দেখেন নাই, কত দূরের সম্পর্কের ভাই আমি, তবু কোথা হইতে তাহার অন্তরে আমার জন্য এত মমতা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ মমতা বুঝি বংলাদেশের সকল মেয়েদের অন্তরেই স্বতঃপ্রবাহিত হয়। বাপের বাড়ির কোন আত্মীয়কে এদেশের মেয়েরা অযত্ন করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত চিৎ মেলে।

কার্তিকদার আড্ডায় দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আমাকে খবরের কাগজ বিক্রয় করিলেই চলিবে না। কলিকাতায় আসিয়া লেখাপড়া করিতে হইবে। নেতাদের কথায় গোলামখানা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি এখানকার জাতীয় বিদ্যালয়ে আমাকে পড়াশুনা করিতে হইবে। আমহাস্ট স্ট্রীটে একদিন জাতীয় বিদ্যালয় দেখিয়া আসিলাম। ক্লাসে গিয়াও যোগ দিলাম। ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক সবাই ইংরেজীতে পড়ান হয়। মাস্টার একজনও বাংলায় কথা বলেন না। কারণ ক্লাসে হিন্দীভাষী ও উদুভাষী ছাত্র আছে। বাংলায় পড়াইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু নবম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলে কতটাই বা তাহারা বুঝিতে পারিবে! তাদের ইংরেজী বিদ্যার পুজি তো আমার চাইতে বেশী নয়। সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ের মোহ আমার মন হইতে মুছিয়া গেল। নেতাদের মুখে কত গরম গরম বক্তৃতা শুনিয়াছি। ইংরেজ-অমিলের বিদ্যালয়গুলি গোলামখানা; উহা ছাড়িয়া বাইরে আইস। এখানে বসন্তের মধুর হাওয়া বহিতেছে। আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখ, বিদ্যার সূর্য তার সাত ঘোড়া হাঁকাইয়া কিরূপ বেগে চলিতেছে। কিন্তু গোলামখানা ছাড়িয়া আমি কতদিন আসিয়াছি, বসন্তের হাওয়া তো বহিতে দেখিলাম না। জাতীয় বিদ্যালয়ের সেই সাত ঘোড়ার গতিও অনুভব করিতে পারিলাম না।

জাতীয় বিদ্যালয়ের এই সব মাস্টারের চাইতে আমাদের ফরিদপুরের জেলা-ইস্কুলের দক্ষিণাবাবু কত সুন্দর পড়ান, যোগেনবাবু পণ্ডিত মহাশয় কত ভাল পড়ান! আমার মন ভাঙিয়া পড়িল। সারাদিন খবরের কাগজ বেচিয়া রাত্রে ছাদের উপর শুইয়া পড়িতাম, এপাশের ওপাশের সহকর্মীরা ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু আমার ঘুম আসিত না। মায়ের কথা ভাবিতাম, পিতার কথা ভাবিতাম। তাঁহারা আমার জন্য কত চিন্তা করিতেছেন! চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়া যাইত। এ আমি কি করিতেছি? এইভাবে খবরের কাগজ বিক্রয়

করিয়া জীবন কাটাইয়া দিব? আমি লেখাপড়া শিখিব, মূখ হইয়া থাকিব? কে যেন অদৃশ্য স্থান হইতে আমার পিঠে সপাং সপাং করিয়া বেত্রাঘাত করিতেছে। নাঃ, আমি আর সময় নষ্ট করিব না, দেশে ফিরিয়া যাইব। দেশে ফিরিয়া গিয়া ভালমন্দ লেখাপড়া করিয়া মানুষ হইব। আমি সংকল্প স্থির করিরা ফেলিলাম।

দেশে ফিরিবার পূর্বে আমি কলিকাতার সাহিত্যিকদের কাছে পরিচিত হইয়া যাইব। ছেলেবেলা হইতে আমি সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরাগী ছিলাম। তাঁহার সওগাত নামক গল্পগ্রন্থখানিতে মুসলমানদের জীবন লইয়া কয়েকটি গল্প লেখা ছিল। তাহা ছাড়া চারুবাবুর লেখায় যে সহজ কবিত্ব মিশ্রিত ছিল, তাহাই আমাকে তাহার প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। আমি ভাবিলাম, তাঁহার কাছে গেলে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবেন। এমন কি, আমার একটি লেখা প্রবাসীতেও ছাপাইয়া দিতে পারেন। তিনি তখন প্রবাসীর সহকারী-সম্পাদক।

অনেক কষ্টে প্রবাসী-অফিসের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া একদিন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনকার দিনে কনওয়ালিস স্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজের নিকটে এক বাড়ি হইতে প্রবাসী বাহির হইত। প্রবাসী-অফিসের দারোয়ানের কাছে চারুবাবুর সন্ধান করিতেই দারোয়ান মোটা একটি কালো লোককে দেখাইয়া আমাকে বলিল, উনিই চারুবাবু। সেই ভদ্রলোকের সামনে গিয়া সালাম করিয়া দাঁড়াইলাম।

“কি চাই?” বলিয়া তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি কিছু কবিতা লিখেছি, আপনি যদি অনুগ্রহ করে পড়ে দেখেন বড় সুখী হব।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমার তো সময় নেই।"

অতি বিনয়ের সঙ্গে বলিল, "বহুকাল হতে আপনার লেখা পড়ে আমি আপনার অনুরাগী হয়েছি। আপনি সামান্য একটু যদি সময়ের অপব্যয় করেন!"

এই বলিয়া আমি বগলের তলা হইতে আমার কবিতার খাতাখানা তাঁর সামনে টানিয়া ধরিতে উদ্যত হইলাম। ভদ্রলোক যেন ছুৎমার্গ গ্রস্ত কোন হিন্দু বিধবার মত অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়া আমাকে বলিলেন, "আজ আমার মোটেই সময় নেই। কিন্তু ডুবন্ত লোকের মত এই তৃণখণ্ডকে আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছিলাম না। কাকুতিমিনতি করিয়া তাহাকে বলিলাম, "একদিন যদি সামান্য কয়েক মিনিটের জন্যও সময় করেন।" ভদ্রলোকের দয়া হইল। তিনি আমাকে ছয়-সাত দিন পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসিতে বলিলেন। তখন আমার প্রবাসের নৌকার নোঙর ছিড়িয়াছে। দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার মন আকুলিবিকুলি করিতেছে। তবুও আমি সেই কয়দিন কলিকাতায় রহিয়া গেলাম। আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, একবার যদি তাহাকে দিয়া আমার একটি কবিতা পড়াইতে পারি, তবে তিনি আমাকে অতটা অবহেলা করিবেন না। নিশ্চয়ই তিনি আমার কবিতা পছন্দ করিবেন।

আবার সেই খবরের কাগজ বিক্রয় করিতে যাই। পথে পথে 'নায়ক-নায়ক'—বলিয়া চীৎকার করি। কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে আমার গৃহগত মনের আবেগে সিক্ত হইয়া উঠে।

দলে দলে ছেলেরা বই লইয়া ইস্কুলে যায়। দেখিয়া আমার মন উতলা হইয়া উঠে। আমিও পড়িব। দেশে গিয়া ওদের মত বই লইয়া আমিও ইস্কুলে যাইব। এত যে পয়সার অনটন, নিজের আহারের উপযোগী পয়সাই সংগ্রহ করিতে পারি না, তবুও মাঝে মাঝে এক পয়সা দিয়া একটা গোলাপফুল কিনিতাম। দেশে হইলে কারও গাছ হইতে বলিয়া বা না বলিয়া ছিড়িয়া লইলে চলিত। এখানে ফুল পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। আমার একহাতে খবরের কাগজের বাণ্ডিল, আর এক হাতে সেই গোলাপফুল। সঙ্গীসাথীরা ইহা লইয়া আমাকে ঠাট্টা করিত।

আজও আবছা আবছা মনে পড়িতেছে—তের-চৌদ্দ বৎসরের সেই ছোট্ট বালকটি আমি, মোটা খদ্দরের জামা পরিয়া দুপুরের রৌদ্রে কলিকাতার গলিতে গলিতে ঘুরিয়া 'চাই নায়ক' 'চাই নায়ক 'চাই বিজলী' করিয়া চিৎকার করিয়া ফিরিতেছি। গলির দুই পাশে ঘরে ঘরে কত মায়া, কত মমতা. কত শিশুমুখের কলকাকলি। গল্পে কত পড়িয়াছি, এমনি এক ছোট্ট ছেলে পথে পথে ঘুরিতেছিল; এক সহৃদয়া রমণী তাহাকে ডাকিয়া ঘরে তুলিয়া লইলেন। আমার জীবনে এমন ঘটনা কি ঘটিতে পারে না! রবীন্দ্রনাথের "আপদ" অথবা "অতিথি" গল্পের সহৃদয়া মা-দু'টি তত এই কলিকাতা শহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে কত কল্পনাই করিয়াছি। কিন্তু মনের কল্পনার মত ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটিল না। আমার নিকট সুবিস্তৃত কলিকাতা শুধু ইট-পাটকেলের শুষ্কতা লইয়াই বিরাজ করিল।

একদিন খবরের কাগজ লইয়া গলিপথ দিয়া চলিয়াছি। ত্রিতল হইতে এক ভদ্রলোক হাত ইশারা করিয়া আমাকে ডাকিলেন। উপরে গিয়া দেখি তাহার সমস্ত গায়ে বসন্তের গুটি উঠিয়াছে। কোন রকমে তাকে কাগজখানা দিয়া পয়সা লইয়া আসিলাম। সেদিন রাত্রে

শুধু সেই বসন্তরোগগ্রস্ত লোকটিকেই মনে হইতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে ভয় হইতে লাগিল, আমাকেও বুঝি বসন্তরোগে ধরিবে।

আস্তে আস্তে চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করার সেই নির্দিষ্ট দিনটি নিকটে আসিল। বহু কষ্টের উপার্জিত দুইটি পয়সা খরচ করিয়া একটি বাংলা সাবান কিনিয়া ধূলি-মলিন খদ্দরের জামাটি পরিষ্কার করিয়া কাচিলাল। দপ্তরীপাড়ার কোন দপ্তরীর সঙ্গে খাতির জমাইয়া কবিতার খাতাখানিতে রঙিন মলাট পরাইলাম। তারপর সেই বহু-আকাঙিক্ষত নির্দিষ্ট সময়টিতে প্রবাসী-অফিসের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম অল্পক্ষণ পরেই আমার সেই পূর্ব-পরিচিত চারুবাবুকে সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম। তিনি আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। আমি তাড়াতাড়ি সামনে আগাইয়া গিয়া পদধুলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইলাম। তিনি পূর্বদিনের মত করিয়াই আমাকে প্রশ্ন করিলেন,

“তা কি মনে করে?”

আমি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম, “আপনি আমাকে আজ এই সময় আসতে বলেছিলেন। আপনি যদি আমার দু-একটি কবিতা দেখে দিতেন...”

তিনি নাক সিটকাইয়া বলিলেন, “দেখুন, কবিতা লিখে কোন কাজই হয় না। আপনি গদ্য লিখুন।”

আমি আমার পদ্য-লেখা খাতাখানা সামনে ধরিয়া বলিলাম, “আমি তো গদ্যও কিছু লিখেছি।”

ভদ্রলোক দাঁত খিঁচাইয়া ধমকের সঙ্গে বলিলেন, "মশায়, আপনি কি ভেবেছেন আপনার ঐ আজেবাজে লেখা পড়ার সময় আমার আছে?" এই বলিয়া ভদ্রলোক আগাইয়া চলিলেন। কিছুতেই আমার বিশ্বাস হইতেছিলেন না, আমার ধ্যানলোকের সেই সাহিত্যিক চারুবাবু ইনিই হইতে পারেন। ভদ্রলোকের চাকর মাছের খালুই হাতে করিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিল। আমি গিয়া তাহাকে ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। চাকর কি-একটা নাম যেন বলিল। তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, তিনি চারুবাবু নহেন।

রামানন্দ বাবুর বাড়ি আবার গিয়া কড়া নাড়িতেই এক নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তাহার নিকট হইতে চারুবাবুর ঠিকানা লইয়া শিবনারায়ণ দাস লেন তার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। খবর পাঠাইতেই আমাকে দ্বিতলে যাইবার আহ্বান আসিল। অর্ধশায়িত অবস্থায় সেই আগের লোকটির মতই তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি চাই?" ঘরে বোধ হয় আরও দু-একজন ভদ্রলোক ছিলেন। পূর্বের লোকটির কাছ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিয়াছি, তার চিহ্ন বোধ হয় মুখে-চোখে বর্তমান ছিল। তার উপরে একতলা হইতে দ্বিতলে উঠিয়া শ্রান্তিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস লইতেছিলাম। কোন রকমে বলিলাম, "আমার কিছু কবিতা আপনাকে দেখাতে এসেছি।"

ভদ্রলোক অতি কর্কশ ভাবে আমাকে বলিলেন, "তা আমার বাড়িতে এসেছেন কবিতা দেখাতে?"

কল্পলোকের সেই চারুবাবুর কাছে আমি এই জবাব প্রত্যাশা করি নাই। আমি শুধু বলিলাম, "আমার ভুল হয়েছে, আমাকে মাফ করবেন।"

এই বলিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। তখন সমস্ত আকাশবাতাস আমার কাছে বিষে বিষায়িত বলিয়া মনে হইতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, কবিতার খাতাখানা ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই। নিজের কর্ম-শক্তির উপর এত অবিশ্বাস আমার কোন দিনই হয় নাই। আজ এই সব লোককে কত কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করিতেছি। কী এমন হইত, গ্রামবাসী এই ছেলে, টিকে যদি তিনি দুটি মিষ্টিকথা বলিয়াই বিদায় দিতেন। যদি একটা কবিতাই পড়িয়া দেখিতেন, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইত।

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপক, চারুবাবু তখন জগন্নাথ কলেজে পড়ান। একবার আলাপ-আলোচনায় এই গল্প তাঁহাকে কিছুটা মৃদু করিয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে, এটা একেবারে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।"

বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে চারুবাবু বহু অখ্যাত সাহিত্যিককে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

আমার কলিকাতা আসার সকল মোহ কাটিয়া গিয়াছে, এবার বাড়ি যাইতে পারিলেই হয়। কিন্তু আমার যে টাকা আছে তাহাতে রেল-ভাড়া কুলাইয়া উঠিবে না। ফরিদপুরের তরুণ উকিল অধুনা পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতি মৌলবী তমিজউদ্দিন সাহেব তখন ওকালতি ছাড়িয়া কলিকাতা জাতীয় কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। তিনি ছোটকাল হইতেই আমার সাহিত্য-প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতেন। তাহার নিকটে গেলাম বাড়ি যাইবার খরচের টাকা ধার করিতে। তিনি হাসিমুখেই আমাকে একটি টাকা ধার দিলেন, আর বলিলেন, "দেখ, ভোলার কবি মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে আমি তোমার বিষয়ে

আলাপ করেছি। তুমি যদি তার সঙ্গে দেখা কর, তিনি তোমাকে উৎসাহ দেবেন। এমন কি তোমার দু-একটি লেখা ছাপিয়েও দিতে পারেন।”

ছোটকাল হইতে কি করিয়া আমার মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, মুসলমানেরা কেহ ভাল লিখিতে পারেন না। সেইজন্য মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার আমার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তমিজউদ্দিন সাহেব আমাকে বার বার বলিয়া দিলেন, “তুমি অবশ্য মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যেও।”

সাধারণ কৌতূহলের বশেই মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি তখন কারমাইকেল হোস্টেলে থাকিতেন। মোজাম্মেল হক সাহেব আমার কয়েকটি কবিতা পড়িয়া খুবই প্রশংসা করিলেন এবং আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “বৎসরের প্রথম মাসে আমার পত্রিকায় কোন নূতন লেখকের লেখা ছাপি না। কিন্তু আপনার লেখা আমি বৎসরের প্রথম সংখ্যাতেই ছাপব।”

আমি মুসলমান হইয়া কেন মাথায় টুপি পরি নাই—এই বলিয়া তিনি আমাকে অনুযোগ করিলেন। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি বাড়ি হইতে টুপি লইয়া আসি নাই, আর এখানে টুপি কেনার পয়সা আমার নাই, সেকথা বলিতে পারিলাম না। সে আজ তিরিশ বৎসরেরও আগের কথা। তখনকার দিনে মুসলমানের অধিকাংশই ধুতি আর মাথায় টুপি পরিতেন। বড়রা সকলেই দাড়ি রাখিতেন। আজ নতুন ইসলামী জোস লইয়া মুসলমান-সমাজ হইতে টুপি ও দাড়ি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

তিনি তখন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক।



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মোজাম্মেল হক সাহেব আমাকে আরও বলিয়াছিলেন, "আপনি অবশ্য অবশ্য হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি আপনার লেখার আদর করবেন। আপনার লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার কিছু সাদৃশ্য আছে।"

কবি নজরুল ইসলামের বেশী লেখা আমি ইহার আগে পড়ি নাই। মুসলমান লেখকের মধ্যে মহাকবি কায়কোবাদের পর আমি কবি সাহাদাত হোসেন সাহেবকেই সবচেয়ে বড় লেখক বলিয়া মনে করিতাম। নজরুলের 'বাদল বরিষণে' নামক একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, তাহা রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

কবি মোজাম্মেল হক সাহেবের নিকট উৎসাহ পাইয়া পূর্ব অবহেলার ক্ষতগুলির আঘাত আমার মন হইতে কতকটা প্রশমিত হইয়াছিল। আমি নজরুলের সঙ্গে দেখা করিব স্থির করিলাম। পকেটে যে যক্ষের সম্পত্তি জমা ছিল;—তাহা ভাল মত গুণিয়া মনে মনে অঙ্ক কষিয়া দেখিলাম, ইহা হইতে যদি তিনটি পয়সা খরচ করি, তাহা হইলে আমার বাড়ি যাওয়ার ভাড়া কম পড়িবে না। সুতরাং তিনটি পয়সা খরচ করিয়া বৈঠকখানা রোডের এক দর্জীর দোকান হইতে একটি সাদা টুপি কিনিয়া মাথায় পরিয়া নজরুল সন্দর্শনে রওনা হইলাম। টুপির জন্য ইতিপূর্বে মোজাম্মেল হক সাহেবের কাছে অনুযোগ শুনিয়াছি, নজরুলও হয়ত সেইরূপ অনুযোগ করিতে পারেন। সেইজন্য সেই বহু আয়াসের উপার্জিত তিনটি পয়সা খরচ করিতে হইল।

তখন নজরুল থাকিতেন কলেজ স্ত্রীটের বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যসমিতির অফিসে। গিয়া দেখি, কবি বারান্দায় বসিয়া কি লিখিতেছেন। আমার খবর পাইয়া, তিনি লেখা ছাড়িয়া

ছুটিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলাম, "আপনি লিখছিলেন—আগে আপনার লেখা শেষ করুন, পরে আপনার সঙ্গে আলাপ করব। আমি অপেক্ষা করছি।" কবি তাঁহার পূর্ব লেখায় মনোনিবেশ করিলেন। আমি লেখন-রত কবিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কবির সমস্ত অবয়বে কী যেন এক মধুর মোহ মিশিয়া আছে। দু'টি বড় বড় চোখ শিশুর মত সরল। ঘরের সমস্ত পরিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া আমার ইহাই মনে হইল, এত কষ্টের তিনটি পয়সা খরচ করিয়া কিস্তি-টুপিটি না কিনিলেও চলিত। কবির নিজের পোশাকেও কোন টুপি-আচকান-পায়জামার গন্ধ পাইলাম না।

অল্প সময়ের মধ্যেই কবি তাহার লেখা শেষ করিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিলেন। আমি অনুরোধ করিলাম, কী লিখিয়াছেন আগে আমাকে পড়িয়া শোনান।

হার-মানা হার পরাই তোমার গলে...ইত্যাদি–

কবি-কণ্ঠের সেই মধুর স্বর এখনও কানে লাগিয়া আছে। কবিকে আমি আমার কবিতার খাতাখানি পড়িতে দিলাম। কবি দুই-একটি কবিতা পড়িয়াই খুব উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিলেন। আমার কবিতার খাতা মাথায় লইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। আমার রচনার যে স্থানে কিছুটা বাকপটুত্ব ছিল, সেই লাইনগুলি বারবার আওড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় বিশ্বপতি চোধুরী মহাশয় কবির সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তখন বিশ্বপতিবাবুর 'ঘরের ডাক' নামক উপন্যাস প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। দুই বন্ধুতে বহু রকমের আলাপ হইল। কবি তাহার বহু কবিতা আবৃত্তি করিয়া

শুনাইলেন। সেইদিন কবির মুখে তাঁহার পলাতকা কবিতাটির আবৃত্তি বড়ই ভাল লাগিয়াছিল :

আচমকা কোন্ শশক-শিশু চমকে ডেকে যায়,
ওরে আয়–
আয়ুরে বনের চপল চখা,
ওরে আমার পলাতক!
ধানের শীষে শ্যামার শিষে
যাদুমণি বল সে কিসে
তোরে কে পিয়াল সবুজ স্নেহের কাঁচা বিষে রে!

এই কবিতার অনুপ্রাস-ধ্বনি আমাকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছিল। আজ পরিণত বয়সে বুঝিতে পারিতেছি, কবিতার মধ্যে যে করুণ সুরটি ফুটাইয়া তুলিতে কবি চেষ্টা করিয়াছেন, অনুপ্রাস বরঞ্চ তাহাকে কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, নজরুলের বয়স তখন খুবই অল্প।

গল্পগুজব শেষ হইলে কবি আমাকে বলিলেন, “আপনার কবিতার খাতা রেখে যান। আমি দুপুরের মধ্যে সমস্ত পড়ে শেষ করব। আপনি চারটার সময় আসবেন।”

কবির নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব আর স্নেহ-মধুর ব্যবহার আমার অবচেতন মনে কাজ করিতে লাগিল। কোন্ অশরীরী ফেরেস্তা যেন আমার মনের বীণার তারে তাহার কোমল অঙ্গুলি রাখিয়া অপূর্ব সুর-লহরীর বিস্তার করিতে লাগিল।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তাহার প্রভাবে সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি, এমন কি, কলিকাতার নোংরা বস্তি গাড়ী-ঘোড়া-ট্রামও আমার কাছে অপূর্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

চারিটা না বাজিতেই কবির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কবি আমারই কবিতার খাতাখানা লইয়া অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়িতেছেন। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া সহাস্যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। অতি মধুর স্নেহে বলিলেন, "তোমার কবিতার মধ্যে যেগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে, আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। এগুলি নকল করে তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও। আমি কলিকাতার মাসিকপত্র গুলিতে প্রকাশ করব।"

এমন সময় কবির কয়েকজন বন্ধু কবির সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। কবি তাহাদিগকে আমার কয়টি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। বন্ধুরা আমার কবিতা শোনার চাইতে কবিকে কোথাও লইয়া যাইবার জন্য মনোযোগী ছিলেন। কবি হাবিলদারের পোশাক পরিতে পরিতে গান গাহিয়া উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া লাফাইয়া ঝাপাইয়া নিজের প্রাণ-চাঞ্চল্যের প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি কবির নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

কার্তিকদার আড্ডায় আসিয়া দেখি, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। আমারই মতন জনৈক পথে-কুড়ান ভাই তাঁহার বাক্স হইতে টাকাপয়সা যাহা-কিছু ছিল, সমস্ত লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। এই লোকটি আমাদের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিতেন : নিজে অভুক্ত থাকিয়া, কতদিন দেখিয়াছি, এমনই পথে-পাওয়া তার কোন অনাহারী ভাইকে খাওয়াইতেছেন। এই কি তার প্রতিদান!



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আমি দেশে চলিয়া যাইব কলিতে কার্তিকদা খুশী হইলেন। আমাকে বলিলেন, “তুমি দেশে গিয়ে পড়াশুনা কর। মানুষ হয়ে আবার কলকাতা এসো। দেখবে, সবাই তোমায় আদর করবে। আমিও তোমার মত দেশে গিয়ে পড়াশুনা করতাম, লজ্জায় যেতে পারছি না। যে সব ছাত্র আমার মত বিদ্যালয়ের গোলামখানা ছেড়ে আসেনি, তাদের কত গালি দিয়েছি; টিটকারী করে বক্তৃতা দিয়েছি। আবার তাদের মধ্যে কোন্ মুখে ফিরে যাব?”

বিদায় লইবার সময় আমার মাদুর থানা কার্তিকদাকে দিয়া আনিলাম কার্তিকদা তাহা বিনা দামে কিছুতেই লইলেন না তিনি জোর করিয়া আমার পকেটে মাদুরের দামটা দিয়া দিলেন। স্টেশনে আসিয়া আমার টিকিট খরিদ করিয়া দিলেন। বিদায় লইয়া আসিবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন, “জসীম, যখন যেখানেই থাকবি, মনে রাখিস তোর এই কার্তিকদার মনে তোর আসনটি চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমার জীবন হয়তো এই ভাবেই নষ্ট হয়ে যাবে। পড়াশুনা করে মানুষ হবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা জীবনে ঘটবে না। নেতাদের কথায় কলেজ ছেড়ে যে ভুল করেছি, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে হয়তো সারা জীবন করতে হবে। কিন্তু তোর জীবনে এই ভুল সংশোধন করার সুযোগ হল; তুই যেন বড় হয়ে তোর কার্তিকদাকে ভুলে যাসনে। নিশ্চয় তুই একজন বড় কবি হতে পারবি। তখন আমাদের কথা মনে রাখিস।”

আমি অশ্রুসজল নয়নে বলিলাম, “কার্তিকদা, তোমাকে কোনদিন ভুলব না। ভাল কাজ করলে সেই কাজে বোনা বীজের মত মানুষের মনে অঙ্কুর জন্মাতে থাকে। হয়তো সকলের অন্তরে সেই বীজ হতে অঙ্কুর হয় না। কিন্তু একথা মনে রাখবেন, ভাল কাজ বৃথা যায় না। আপনার কথা এই দূরদেশী ছোট ভাইটির মনে চিরকাল জাগ্রত থাকবে।”

তখনকার কিশোর বয়সে এইসব কথা তেমন করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিয়াছিলাম কিনা মনে নাই। কিন্তু আজও আমার মনের গহন কোণে কার্তিকদার সৌম্য মূর্তি চির-উজ্জ্বল হইয়া আছে। এতটুকুও ম্লান হয় নাই। দেশে ফিরিয়া আসিয়া কার্তিকদার কাছে পত্র লিখিয়াছিলাম। কোন উত্তর পাই নাই। হয়তো তিনি তখন অন্যত্র বাসা বদল করিয়াছিলেন। তারপর কতজনের কাছে কার্তিকদার অনুসন্ধান করিয়াছি। কেহ তাহার খবর বলিতে পারে নাই। আজ আমার কিঞ্চিৎ কবিখ্যাতি হইয়াছে। আমার বইগুলি পড়িলে কার্তিকদা কত সুখী হইতেন! বঙ্গ বিভাগের পর তিনি কোথায় গিয়াছেন, কে জানে? হয়তো অনেকগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া তিনি কোন সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, আমার মা আমার জন্য চিন্তা করিয়া শুখাইয়া গিয়াছেন। পিতা নানাস্থানে আমার খোঁজখবর লইয়া অস্থির হইয়াছেন। আজীবন মাস্টারী করিয়া ছেলেদের মনোবিজ্ঞান তাঁর ভাল ভাবেই জানা ছিল। তিনি জানিতেন চোদ্দপনর বৎসরের ছেলেরা এমনি করিয়া বাড়ি হইতে পলাইয়া যায়; আবার ফিরিয়া অস। সেই জন্য তিনি আমার ইস্কুলের বেতন ঠিকমত দিয়া আসিতেছিলেন।

মা আমাকে সামনে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। বাড়ির আম সেই কবে পাকিয়াছিল, তাহা অতি যত্নে আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। অর্ধেক পচিয়া গিয়াছে তবু ছোট ভাই-বোনদের খাইতে দেন নাই আমি আসিলে খাইব বলিয়া।

আবার ইস্কুলে যাইতে লাগিলাম। নজরুল ইসলাম, সাহেবের নিকট কবিতার নকল পাঠাইয়া সুদীর্ঘ পত্র লিখিলাম। কবির নিকট হইতে কবিতার মতই সুন্দর উত্তর আসিল। কবি আমাকে লিখিলেন—

"ভাই শিশুকবি, তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দখিন হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু কুসুমগুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই হবে আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহন বিবরে।"

কবির নিকট হইতে এরূপ চার-পাঁচখানা পত্র পাইয়াছিলাম। তাহা সেকালের অতি উৎসাহের দিনে বন্ধুবান্ধবদের দেখাইতে দেখাইতে হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিছুদিন পরে মোসলেম ভারতে যে সংখ্যায় কবির বিখ্যাত 'বিদ্রোহ' কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সংখ্যায় 'মিলন-গান' নামে আমারও একটি কবিতা ছাপা হইয়াছিল। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত সাধনা পত্রিকাতেও আমার দুই-তিনটি কবিতা ছাপা হয়। ইহা সবই কবির চেষ্টায়। আজও ভাবিয়া বিস্ময় লাগে, তখন কী-ই বা এমন লিখিতাম। কিন্তু সেই অখ্যাত অস্ফুট কিশোর কবিকে তিনি কতই না উৎসাহ দিয়াছিলেন।

তারপর বহুদিন কবির কোন চিঠি পাই নাই। ইনাইয়াবিনাইয়া কবিকে কত কী লিখিয়াছি, কবি নিরুত্তর। হঠাৎ একখানা পত্র পাইলাম, কবি আমাকে ফরিদপুরের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার নরেন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং তাঁর নাতি-নাতকুড়দের বিষয়ে সমস্ত খবর লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর এক নাতি আমারই সহপাঠি ছিল। তাহার সঙ্গে গিয়া তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। ভদ্রমহিলা আমাকে আপন

ছেলের মতই গ্রহণ করিলেন। আমি তাহাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিলাম। তাঁহাদের বাসায় গিয়া শুনিতে পাইলাম, মাসীমার বড় বোন বিরজাসুন্দরী দেবীকে কবি মা বলিয়া ডাকেন। কবির বিষয়ে তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন। সেই হইতে মাসীমা হইলেন কবির সঙ্গে আমার পরিচয়ের নূতন যোগসূত্র। কবি আমাকে পত্র লিখিতেন না। কিন্তু মাসীমা বড়বোন বিরজাসুন্দরী দেবীর নিকট হইতে নিয়মিত পত্র পাইতেন। সেইসব পত্র শুধু নজরুলের কথাতেই ভর্তি থাকিত।

মাসীমা কবির প্রায় অধিকাংশ কবিতাই মুখস্থ বলিতে পারিতেন। নজরুলের প্রশংসা যে দিন খুব বেশী করিতাম, সেদিন মাসীমা আমাকে

খাওয়াইয়া কিছুতেই আসিতে দিতেন না। মাসীমার গৃহটি ছিল রক্ষণশীল হিন্দু-পরিবারের। আজ ভাবিয়া বিস্ময় মনে হয়, কি করিয়া একজন মুসলিম কবির আরবী-ফরাসী মিশ্রিত কবিতাগুলি গৃহ-বন্দিনী একটি হিন্দু-মহিলার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

নজরুলের রচিত ‘মহরম’ কবিতাটি কতবার আমি মাসীমাকে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। মাসীমার আবৃত্তি ছিল বড় মধুর। তার চেহারাটি প্রতিমার মত ঝকমক করিত। একবার আমি নজরুলের উপর একটি কবিতা রচনা করিয়া মাসীমাকে শুনাইয়াছিলাম। সেদিন মাসীমা আমাকে পিঠা খাওয়াইয়াছিলেন। সেই কবিতার কটি লাইন মনে আছে—

নজরুল ইসলাম!<br>
তছলিম ঐ নাম!

বাংলার বাদলার ঘনঘোর ঝঞ্ঝায়,
দামামার দমদম লৌহময় গান গায়;
কাঁপাইয়া সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষ,
আলোড়িত আসমান ধরণীর বক্ষ;
সেই কালে মহাবীর তোমারে যে হেরিলাম,
নজরুল ইসলাম।

নজরুল কাব্য-প্রতিভার যবনিকার অন্তরালে আমার এই মাসীমার এবং তার বোনদের স্নেহ-সুধার দান যে কতখানি, তাহা কেহই কোনদিন জানিতে পারিবে না। বৃক্ষ যখন শাখাবাহু বিস্তার করিয়া ফুলে ফুলে সমস্ত ধরণীকে সজ্জিত করে, তখন সকলের দৃষ্টি সেই বৃক্ষটির উপর। যে গোপন মাটির স্তন্যধারা সেই বৃক্ষটিকে দিনে দিনে জীবনরস দান করে, কে তাহার সন্ধান রাখে? কবি কিন্তু তার জীবনে ইহাদের ভোলেন নাই। মাসীমাকে কবি একখানা সুন্দর শাড়ী উপহার দিয়াছিলেন। মৃত্যুর আগে মাসীমা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় যেন তাঁর মৃতদেহ সেই শাড়ীখানা দিয়া আবৃত করা হয়।

মাসীমার বড় বোন বিরজাসুন্দরী দেবী অশ্রুসজল নয়নে আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার মাসীমার সেই শেষ ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছিল।"

বহুদিন কবির চিঠি পাই না। হঠাৎ এক পত্ব পাইলাম, কবি 'ধূমকেতু' নাম দিয়া একখানা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিতেছেন তিনি আমাকে লিখিয়াছেন ধূমকেতুর গ্রাহক সংগ্রহ করিতে। ছেলেমানুষ আমি—আমার কথায় কে ধূমকেতুর গ্রাহক হইবে? সুফী

মোতাহার হোসেন অধুনা কবিখ্যাতিসম্পন্ন; সে তখন জেলা ইস্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সে আমার কথায় ধুমকেতুর গ্রাহক হইল। তখন দেশে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল। দেশের নেতারা পুঁথিপত্র ঘাটিয়া রক্তপাতহীন আন্দোলনের নজির খুঁজিতেছিলেন। নজরুলের ধূমকেতু কিন্তু রক্তময় বিপ্লববাদের অগ্নি-অক্ষর লইয়া বাহির হইল। প্রত্যেক সংখ্যায় নজরুল যে অগ্নি উদারী সম্পাদকীয় লিখিতেন, তাহা পড়িয়া আমাদের ধমনীতে রক্ত প্রবাহ ছুটিত। সেই সময়ে বিপ্লবীরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যে মারণ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, নজরুল-সাহিত্য তাহাতে অনেকখানি ইন্ধন যোগাইয়াছিল। তাহার সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি আমরা বার বার পড়িয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম। একটি প্রবন্ধের নাম ছিল "ম্যাঁয় ভুখা হুঁ! ভারতমাতা অন্তরীক্ষ হইতে বলিতেছেন, আনি রক্ত চাই, নিজ সন্তানের রক্ত দিয়া তিমিররাত্রির বুকে নব-প্রভাতের পদরেখা অঙ্কিত করিব।" ধূমকেতুর মধ্যে যে সব খবর বাহির হইত, তাহার মধ্যেও কবির এই সুরটির রেশ পাওয়া যাইত।

ধূমকেতুতে প্রকাশিত একটি কবিতার জন্য কবিকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারে কবির জেল হইল। জেলের নিয়ম-শৃঙ্খলা না মানার জন্য কর্তৃপক্ষ কবির প্রতি কঠোর হইয়া উঠিলেন। কবি অনশন আরম্ভ করিলেন। কবির অনশন যখন তিরিশ দিনে পরিণত হইল তখন সারা দেশ কবির জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত সকলেই কবিকে অনাহার-ব্বত ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিলেন। কবি নিজ সঙ্কল্পে অচল অটল। তখনকার দিনে বাঙালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে কবির অনশন উপলক্ষে গভর্নমেন্টের কার্যের প্রতিবাদে কলিকাতায় বিরাট সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় হাজার হাজার লোক কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইলেন। দেশবন্ধু তাঁহার উদাত্ত ভাষায় কবির মহাপ্রতিভার উচ্চ প্রংশসা

করিলেন। বাংলাদেশের খবরের কাগজ গুলিতে প্রতিদিন নজরুলের কাব্য-মহিমা বাঙালীর হৃদয় তন্ত্রীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নজরুলের বিজয়বৈজয়ন্তির কী-ই না যুগ গিয়াছে! কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, নজরুল রবীন্দ্রনাথের চাইতেও বড় কবি।

অনশন ব্রত কবির জীবনে একটা মহাঘটনা। যাঁহারা কবিকে জানেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, কবি সংযম কাহাকে বলে জানিতেন না। রাজনৈতিক বহু নেতা এরূপ বহুবার অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন ত্যাগে অভ্যস্ত। কবির মত একজন প্রাণচঞ্চল লোক কি করিয়া জেলের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা এক আশ্চর্য ঘটনা। দিনের পর দিন এইরূপ অনশন একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নজরুল-জীবনের এই সময়টি এক মহামহিমার যুগ। কোন অন্যায়ের সঙ্গেই মিটমাট করিয়া চলিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। সেই সময়ে দেখিয়াছি, কত অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার দিন গিয়াছে। যদি একটু নরম হইয়া চলিতেন, যদি লোকের চাহিদা মত কিছু লিখিতেন, তবে সম্মানের আর সম্পদের সিংহাসন আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইত।

তাঁহার ভিতরে কবি এবং দেশপ্রেমিক একসঙ্গে বাসা বাঁধিয়াছিল। আদর্শবাদী নেতা এবং সাহিত্যিকের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে। চল্লিশ দিন অনশনের পর কবি অম্ল-গ্রহণ করিলেন। তারপর জেল হইতে বাহির হইয়া আসিলে চারিদিকে কবির জয় ডঙ্কা বাজিতে লাগিল। আমার মত শিশু-কবির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেই মহা কলরব ভেদ করিয়া কবির নিকট পৌঁছিতে পারিল না।

আমি তখন সবে আই. এ. ক্লাসে উঠিয়াছি। আমার কবিতার রচনা-রীতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিতাম, বহু কাগজে তাহা ছাপা হইয়াছে। এমন কি প্রবাসী কাগজে পর্যন্ত আমার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য-জীবন লইয়া গ্রাম্য-ভাষায় যখন কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম, কেহই তাহা পছন্দ করিল না। কাগজের সম্পাদকেরা আমার লেখা পাওয়া মাত্র ফেরত পাঠাইয়া দিতেন। সবটুকু হয়তো পড়িয়াও দেখিতেন না। সেই সময়ে আমার মনে যে কি দারুণ দুঃখ হইত, তাহা বর্ণনার অতীত।

একবার গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলায় আমাদের গ্রামের মাঠ দিয়া চলিয়াছি, এমন সকয় পিয়ন আসিয়া ভারতবর্ষ হইতে অমানেনীত "বাপের বাড়ির কথা" নামক কবিতাটি ফেরত দিয়া গেল। পিয়ন চলিয়া গেলে আমি মনোদুঃখে সেই ঢেলা-ভরা চষা-ক্ষেতের মধ্যে লুটাইয়া পড়িলাম। কিন্তু চারিদিক হইতে যতই অবহেলা আসুক না কেন আমার মনের মধ্যে জোর ছিল। আমার মনে ভরসা ছিল, আমি যাদের কথা লিখিতেছি, আরও ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে নিশ্চয়ই দেশ একদিন আমার কবিতার আদর করিবে।

সেই সময়ে আমার কেবলই মনে হইত, একবার যদি কবি নজরুলের সঙ্গে দেখা করিতে পারি, নিশ্চয় তিনি আমার কবিতা পছন্দ করিবেন। গ্রাম্য-জীবন লইয়া কবিতা লিখিতে লিখিতে আমি গ্রাম-কবিদের রচিত গানগুলিরও অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আমার সংগৃহীত কিছু গ্রাম-গান দেখিয়া পরলোকগত সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমাকে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করিতে পরামর্শ দেন।



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কংগ্রেস-অফিসের সাময়িক স্বেচ্ছাসেবক হইয়া তাহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে করিতে আমি কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হই। পথের যত ধূলি আর গুড়ো-কয়লা রজক গৃহ-সম্পর্কহীন আমার শ্রীঅঙ্গের মোটা খদ্দরে, কিস্তি-নৌকার মত চর্ম-পাদুকাজোড়ায়, এবং তৈলহীন চুলের উপর এমন ভাবে আশ্রয় লইয়াছিল যে তাহার আবরণীর তল ভেদ করিয়া আমার পূর্বপরিচিত কেহ আমাকে সহজে আবিষ্কার করিতে পারিত না।

সুবিস্তৃত জন-অরণ্য কলিকাতায় আমি কাহাকেও চিনি না। কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইব? কে আমাকে থাকিবার জায়গা দিবে। যদি কবি নজরুলের সন্ধান পাই,তার স্নেহের শিশু-কবিকে নিশ্চয় তিনি অবহেলা করিবেন না। মুসলিম পাবলিশিং হাউসে আসিয়া আফজল মিঞার কাছে কবির সন্ধান লইলাম। আফজল মিঞা বলিলেন, "আপনি অপেক্ষা করুন। কবি একটু পরেই এখানে আসবেন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের মত কবি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আফজল সাহেব বলিলেন, "জসীম উদ্দীন এসেচে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

"কই জসীম উদ্দীন?" বলিয়া কবি এদিক-ওদিক চাহিলেন। আফজল সাহেব আমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি কবিকে সালাম করিলাম।

কবি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কই, তোমার লেখা কোথাও তো দেখিনি?" আমি কবির নিকট আমার কবিতার খাতাখানা আগাইয়া দিতে গেলাম। কিন্তু কবি তাঁহার গুণগ্রাহীদের দ্বারা এমনই পরিবৃত হইলেন যে আমি আর বৃহভেদ করিয়া কবির নিকটে পৌঁছিতে পারিলাম না।

অল্পক্ষণ পরেই কবি ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, “আমাকে এখন হুগলী যেতে হবে।”

আগাইয়া গিয়া বলিলাম, “আমি বহুদূর থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।”

কবি আমাকে বলিলেন, “একদিন হুগলীতে আমার ওখানে এসো। অজি আমি যাই।”

এই বলিয়া কবি একটি ট্যাক্সী ডাকিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। আমিও কবির সঙ্গে সেই ট্যাক্সীতে গিয়া উঠিলাম। কবির প্রকাশক মৈনুদ্দিন হুয়েন সাহেবও কবির সঙ্গে ছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, ট্যাক্সীতে বসিয়া কবির সঙ্গে দু-চারটি কথা বলিতে পারি। কিন্তু মৈনুদ্দিন সাহেবই সব সময় কবির সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। আমি মৈনুদ্দিন সাহেবকে বলিলাম, “আপনি তো কলকাতায় থাকেন। সব সময় কবির সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। আমাকে একটু কবির সঙ্গে কথা বলতে দিন।”

কবি কহিলেন, “বল বল, তোমার কি কথা?”

আমি আর কি উত্তর করিব। কবি আবার মৈনুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। ট্যাক্সী আসিয়া হাওড়ায় থামিল। কবি তাড়াতাড়ি ট্যাক্সী হইতে নামিয়া রেলগাড়ীতে গিয়া উপবেশন করিলেন। রাশি রাশি ধূম উদারণ করিয়া সোঁ-সোঁ শব্দ করিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। আমি স্তব্ধ হইয়া প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গাড়ীর চাকা যেন আমার বুকের উপর কঠিন আঘাত করিয়া চলিতে লাগিল।

এখন আমি কোথায় যাই—কাহার নিকটে গিয়া আশ্রয় লই? ফরিদপুরের এক ভদ্রলোক হারিসন রোডে ডজ-ফার্মেসীতে কাজ করিতেন। তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু হারিসন রোডের ডজ-ফার্মেসী কোথায় আমি জানি না। একে তো ট্রেনভ্রমণে ক্লান্ত, তার উপর সারাদিন কিছু আহার হয় নাই। হাওড়া হইতে শিয়ালদহ পর্যন্ত রাস্তার এপারে-ওপারে তিন-চার বার ঘুরিয়া ভজ-ফার্মেসীর সন্ধান পাইলাম। ফার্মেসীতে কংগ্রেসের জন্য সংগৃহীত টাকার বাক্সটি রাখিয়া ফুটপাথের উপর শুইয়া পড়িলাম। তখন আমি এত ক্লান্ত যে সারাদিনের অনাহারের পরে খাওয়ার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

ইহার বহুদিন পরে আমাদের ফরিদপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসিল। এই অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রতিদিন গাড়ী ভরিয়া বহু নেতা আমাদের বাড়ির পাশের স্টেশনে আসিয়া নামিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ পরিয়া আমরা তাহাদের অভ্যর্থনা করিতাম। একদিন আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, কবি নজরুল কয়েকজন শিষ্য সহ আমাদের বাড়িতে উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কবির সঙ্গে কমিউনিস্ট আবদুল হালিম, গায়ক মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আর একজন যুবক ছিলেন আমি কবিকে সানন্দে আমাদের বাড়ি লইয়া আসিলাম। রান্নার দেরি ছিল। কবিকে আমাদের নদীতীরের বাঁশবনের ছায়াতলে মাদুর পাতিয়া বসিতে দিলাম। তখন বড়-পদ্মা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন চর পড়িয়া পদ্মা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু একটি ছোট্ট নদীরেখা এখনও আমাদের বাড়ির পাশ দিয়া প্রবাহিত হয়।

কবির হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়া বলিলাম, “কবিভাই, আপনি একটা কিছু লিখে দিন।”

আধঘণ্টার মধ্যে কবি একটি অপূর্ব কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন কবিতাটি হারাইয়া ফেলিয়াছি। সেজন্য মনে বড়ই অনুতাপ হয়। তার দুটি লাইন মনে আছে—

“আকাশেতে একলা দোলে একাদশীর চাঁদ
নদীর তীরে ডিঙিতরী পথিক-ধরা ফাঁদ।”

সন্ধ্যাবেলা নৌকা করিয়া কবিকে নদীর ওপারের চরে লইয়া গেলাম। সেখানে আমি একটি ইস্কুল খুলিয়াছিলাম। গ্রামের লোকেরা রাত্রিকালে আসিয়া সেই ইস্কুলে লেখাপড়া করিত। তারপর সকলে মিলিয়া গান গাহিত। আমার মনে হইয়াছিল, এই গান যদি কবির ভাল লাগে তবে কবিকে এখানে বহু দিন ধরিয়া রাখিতে পারি।

সেদিন কবির আগমনে বালুচরের কৃষাণ-পল্লীতে সাড়া পড়িয়া গেল। ওপাড়া হইতে আজগর ফকিরকে খবর দেওয়া হইল, চরকেষ্টপুরের মথুর ফকিরও আসিলেন। তাহারা যখন গান ধরিলেন, তখন মনে হইল আল্লার আসমান গানের সুরে সুরে কাঁপিতেছে। কবি সে গানের খুবই তারিফ করিলেন। কিন্তু তবু মনে হইল, যেমনটি করিয়া কবিকে এই গানে মাতাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা হইল না। সেই সময়ে কবির মন রণ-দুন্দুভির নিনাদে ভরপুর ছিল। এই সব গ্রাম-গানের ভাববস্তুর জন্য কবির হৃদয়ে কোন স্থান তৈরী হয় নাই।

রাত্রিবেলা এক মুস্কিলে পড়া গেল। চা না পাইয়া কবি অস্থির হইয়া উঠলেন। এই পাড়াগাঁয়ে চা কোথায় পাইব? নদীর ওপারে গিয়া চা লইয়া আসিব, তাহারও উপায় নাই।

রাত্রিকালে কে সাহস করিয়া এত বড় পদ্মা-নদী পাড়ি দিবে? তখন তিন-চার গ্রামে লোক পাঠান হইল চায়ের অনুসন্ধানে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আলিম মাতব্বরের বাড়ি হইতে কয়েটা চায়ের পাতা বাহির হইল। তিনি একবার কলিকাতা গিয়া চা খাওয়া শিখিয়া আসিয়াছিলেন। গ্রামের লোকদের চা খাওয়াইয়া তাজ্জব বানাইয়া দিবার জন্য কলিকাতর হইতে তিনি কিছু চা-পাতা লইয়া আসিয়াছিলেন। গ্রামের লোকদের খাওয়াইয়া চা-পাতা যখন কম হইয়া আসিত, তখন তাহার সহিত কিছু শুকনা ঘাসপাতা মিশাইয়া চায়ের ভাণ্ডার তিনি অফুরন্ত রাখিতেন। তিনি অতি গর্বের সহিত তাহার কলিকাতা-ভ্রমণের অশ্চর্য কাহিনী বলিতে বলিতে সেই চা-পাতা আনিয়া কবিকে উপঢৌকন দিলেন। চা-পাতা দেখিয়া কবির তখন কী আনন্দ।

মহামূল্য চা এখন কে জ্বাল দিবে? এ-বাড়ির বড়বো ও-বাড়ির ছোটবৌ—সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যাহার যত রন্ধন-বিদ্যা জানা ছিল সমস্ত উজাড় করিয়া সেই অপূর্ব চা রন্ধন-পর্ব সমাধা করিল। অবশেষে চা বদনায় ভর্তি হইয়া বৈঠকখানায় আগমন করিল। কবির সঙ্গে আমরাও তাহার কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইলাম। কবি তো মহাপুরুষ। চা পান করিতে করিতে চারাঁধুনিদের অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরাও কবির সঙ্গে ধুয়া ধরিলাম। গ্রামচাষীর বাড়িতে যত রকমের তরকারী রান্না হইয়া থাকে, সেই চায়ের মধ্যে তাহার সবগুলিরই আস্বাদ মিশ্রিত ছিল। কমিউনিস্ট-কর্মী আবদুল হালিম বড়ই সমালোচনাপ্রবণ। তাঁহার সমালোচনা মতে সেই চা-রামায়ণের রচয়িত্রীরা নাকি লঙ্কাকাণ্ডের উপর বেশী জোর দিয়াছিলেন। আমাদের মতে চা-পর্বে সকল ভোজনরসের সব গুলিকেই সম মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তীকালে বহু গুণীজনের কাছে এই চা খাওয়ার বর্ণনা করিয়া কবি আনন্দ পরিবেশন করিতেন।

পরদিন পূর্ব আকাশে অপূর্বদ্যুতি জবাকুসুমের রঙে রঙিন হইয়া সূর্যোদয় হইল। আমরা কবিকে লইয়া বিদায় হইলাম। দুই পাশের শস্যক্ষেত্রে সবুজ নতুন পত্র-মঞ্জরী দেখা দিয়াছে। রাতের শিশির-স্নাত পত্রগুলি বিহানবেলার রৌদ্রে ঝলমল করিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। কবি 'বিষের বাঁশী' আর 'ভাঙ্গার গান' সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এই বই দুইখানি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। কবির শিষ্যদল কনফারেন্সের অধিবেশনে এই বই বিক্রয় করিবার জন্য, আনিয়াছিলেন। বইগুলি আমার বাড়িতে রাখিয়া কবি ফরিদপুর শহরে কনফারেন্সের ময়দানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। থাকিবার জন্য তাঁহাকে একটি তাঁবু দেওয়া হইল। আমি হইলাম কবির খাস-ভলান্টিয়ার।

এই কনফারেন্সে বাংলাদেশের বহু নেতা আসিয়াছিলেন। তখন কবি ভাল বক্তৃতা করিতে শেখেন নাই। সভায় কবি যাহা বলিলেন, তাহা নিতান্ত মামুলী ধরনের। কিন্তু কবি যখন গান ধরিলেন, সেই গানের কথায় সমস্ত সভা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। গান ছাড়িলে সভার লোকে আরও গান শুনিবার জন্য চিৎকার করিয়া উঠিতেছিল। কবির কণ্ঠস্বর যে খুব সুন্দর ছিল তাহা নয়, কিন্তু গান গাহিবার সময় গানের কথা-বস্তুকে তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়া জীবন্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। কবি যখন 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া অথবা 'শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল' প্রভৃতি গান গাহিতেছিলেন, তখন সভায় যে অপূর্ব ভাবরসের উদয় হইতেছিল, তাহা ভাষায় বলিবার নয়। জেল হইতে সদ্য খালাস পাইয়া বহু দেশকর্মী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। দেশকে ভালবাসিয়া শতসহস্র কমী আপন অঙ্গে লাঞ্ছনার তিলক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। নজরুলের গান যেন তাহাদের দুঃখ-লাঞ্ছনার আশাআকাক্ষার জীবন্ত প্রতীক।

একদিন মহাত্মা গান্ধীর সামনে নজরুল তাঁর ঘোর ঘোর ঘোর ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর'—গানটি গাহিলেন। গান্ধীজী গান শুনিয়া হাসিয়া কুটিকুটি। কনফারেন্স শেষ হইলে কবি আবার আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবি স্থির করিলেন, তিনি এখানে বসিয়া বাবুচর' নামে একখানা বই লিখিবেন। কিছুদিন কবির সঙ্গে কাটাইতে পারিব, এই আশায় মন পুলকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু অল্পদিন পরে পাবনা হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়া কবিকে চিলের মত ছোঁ। মারিয়া লইয়া গেলেন। যাইবার সময় কবি কথা দিয়া গেলেন, ফিরিবার সময় আবার আমার এখানে আসিবেন।

কবির বাজেয়াপ্ত বইগুলির কিছু আমার কাছে রাখিয়া গেলেন। কিন্তু কবি আর ফিরিয়া আসিলেন না। বহুদিন পরে কবি চিঠি লিখিলেন, বইগুলির কিছু যদি বিক্রয় হইয়া থাকে তবে আমি যেন সত্বর তাহাকে টাকাটা পাঠাইয়া দিই। কবির অসুখ। অর্থের খুব টানাটানি। কিন্তু বাজেয়াপ্ত বই কেহ কিনিতে চাহে না। পুলিসে ধরা পড়িবার ভয় আছে। কিছুই বিক্রয় করিতে পারি নাই। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাম্য-গান সংগ্রহের জন্য মাসে সত্তর টাকা করিয়া স্কলারশিপ পাইতাম। সেই টাকা হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ কবির নিকট মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলাম।

একবার কলিকাতা গিয়া কবির সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাসায় যাই। তখন বিবাহ করিয়া সদ্য সংসার পাতিয়াছেন। হাস্যরসিক নলিনী সরকার মহাশয়ের বাসায় তিনি থাকেন। কবি আমাকে শয়ন-গৃহে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নতুন ভাবীর সঙ্গে কবি লুডো

খেলিতেছিলেন। ভাবীর সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া কবি আমাকেও খেলিতে আহ্বান করিলেন। আমি অনেকক্ষণ তাহাদের সঙ্গে খেলিলাম। ভাবীর সেই রাঙা-টুকটুকে মুখের হাসিটি আজও মনে আছে। তখন কবির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। কবিপ্রিয়া কিন্তু আমাকে না খাইয়া আসিতে দিলেন না। আমি কবির কোন রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় নই। তবু কবি আমাকে আপন ভাইএর মত তাঁর গৃহের একজন করিয়া লইলেন। এর পর যখনই কবিগৃহে গমন করিয়াছি, কবি-পত্নীর ব্যবহারে সঁহাদের গৃহখানি আমার আপন বলিয়া মনে হইয়াছে।

আমি তখন মেছুয়াবাজারে ওয়াই, এম. সি এ হোস্টেলে থাকিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ি। আমাদের হোস্টেলে মাঝে মাঝে নানা রকম উৎসব-অনুষ্ঠান হইত। তাহাতে হোস্টেলের ছাত্রেরা নিজেদের আত্মীয়া মহিলাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। কলিকাতায় আমার কোন নিকট আত্মীয়া নাই, আমি আর কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব! একদিন সেই কথা ভাবীকে বলিলাম। ভাবী অতি সহজেই আমাদের হোস্টেলে আসিতে রাজী হইলেন। ভাবীর মা খালাআম্মাও সঙ্গে আসিলেন। উৎসব-সভায় তাঁহারা আসিয়া যখন উপবেশন করিলেন, তখন ভাবীকে দেখিবার জন্য ছাত্রমহলে সাড়া পড়িয়া গেল। আমার মনে হয়, কবি-গৃহিণীর জীবনে বাহিরের কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এই প্রথম।

ভাবীর মতন এমন সর্বংসহা মেয়ে বাংলাদেশে খুব কমই পাওয়া যায়। কবির ছন্নছাড়া নোঙরহীন জীবন। এই জীবনের অন্তঃপুরে স্নেহ-মমতায় মধুর হইয়া চিরকাল তিনি কবির কাব্যসাধনাকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। কোন সময় তাঁহাকে কবির সম্পর্কে কোন অভিযোগ করিতে দেখি নাই। প্রথম জীবনে কবি ভাবীকে বহু সুন্দর সুন্দর পত্র

লিখিয়াছেন। ভাবী সেই পত্রগুলি যত্নের ধনের মত রক্ষা করিতেন। একদিন ভাবীকে বলিলাম, "ভাবী, আমি আপনার ভাই। যদি ভরসা দেন তো একটা অনুরোধ আপনাকে করব?

ভাবী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কি অনুরোধ, বল তত ভাই।"

আমি বলিলাম, "কবিভাই আপনাকে যেসব চিঠি লিখেছেন, তার দু-একখানা যদি আপনি আমাকে দেখান।

ভাবীর চোখ দু'টি ছলছল করিয়া উঠিল। সামনে খালাআম্মা বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা, সেসব চিঠি কি ওর কাছে আছে। একবার কি-একটা সামান্য কারণে নুরু রাগ করে সবগুলি চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছে।"

কবির প্রথম ছেলেটির নাম ছিল বুলবুল। বুলবুলের বয়স যখন পাঁচ-ছয় বৎসর, তখন কবি কে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন। অতটুকু ছেলে কী সুন্দর গান করিতে পারিত! কেমন মিষ্টি সুরে কথা বলিত। কবির কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া আমরা তার মুখের মিষ্টিকথা শুনিতাম। অতটুকু বয়সে ওস্তাদী গানের নানা সুর-বিভাগের সঙ্গে সে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কবি হারমনিয়ামে যখন যে কোন সুর বাজাইতেন, বুলবুল শুনিয়াই বলিয়া দিতে পারিত, কবি কোন সুর বাজাইতেছেন। বড় বড় মজলিসে খোকাকে লইয়া কবি বহুবার ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। অতটুকু শিশুর সংগীত-জ্ঞান দেখিয়া বড় বড় ওস্তাদ ধন্য ধন্য করিতেন। এই শিশুটিকে পাইয়া কবির ছন্নছাড়া জীবন কতকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

কবিকে আর কবি-পত্নীকে অনন্ত কান্নার সাগরে ডুবাইয়া সেই বেহেস্তের বুলবুল পাখি বেহেস্তে পলাইয়া গেল। কবির গৃহে শোকের তুফান উঠিল। কবি তার বড় আদরের বুলবুলকে গোরের কাফন পরাইয়া মুসলিম প্রথা অনুসারে কবরস্থ করিয়াছিলেন। বুলবুলের যত খেলনা, তার বেড়াইবার গাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত কবি একটি ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন।

বুলবুলের মৃত্যুর সময় আমি কলিকাতা ছিলাম না। কলিকাতা আসিয়া কবি-গৃহে কবির অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, কবি ডি এম. লাইব্রেরীতে গিয়াছেন। আমি সেখানে গিয়া দেখিতে পাইলাম, কবি এক কোণে বলি... হাস্যরসপ্রধান 'চন্দ্রবিন্দু নামক কাব্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। পুত্রশোক ভুলিবার এই অভিনব উপায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, কবির সমস্ত সঙ্গে বিষাদের ছায়া। চোখ দু'টি কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলিয়া গিয়াছে। কবি দু-একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। এখনও আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, কোন্ শক্তি বলে কবি পুত্রশোকাতুর মনকে এমন অপূর্ব হাস্যরসে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। কবিতা লিখিবার স্থানটিও আশ্চর্যজনক। যাহারা তখনকার দিনে ডি, এম, লাইব্রেরীর স্বল্পপরিসর স্থানটি দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবস্থা অনুমান করিতে পারিবেন। দোকানে অনবরত বেচাকেনা হইতেছে, বাহিরের হট্টগোল কোলাহল—তার এক কোণে বসিয়া কবি রচনা-কার্যে রত।

আমি এই সময় প্রায়ই কবির কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। একদিন এক ভদ্রলোক একখানা চিঠি দিয়া গেলেন। চিঠিখানা পড়িয়া কবি অজস্রভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া আবার চন্দ্রবিন্দু পুস্তকের হাস্যরসের গানগুলি লিখিতে মনোনিবেশ করিলেন। চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলাম—ইহা লিখিয়াছেন, কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু

মোজাফফর আহমদ সাহেব জেল হইতে। বুলবুলের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া কবিকে এই পত্র লিখিয়া তিনি সমবেদনা জানাইয়াছেন। বুলবুলের মৃত্যুর পর তার শতচিহ্ন-জড়িত গৃহে কবির মন টিকিতেছিল না। তাই ডি, এম, লাইব্রেরীর কোলাহলের মধ্যে আসিয়া কবি হাস্যরসের কবিতা লিখিয়া নিজের মনকে বুলবুলের চিন্তা হইতে সরাইয়া রাখিবার প্রয়াস করিতেছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, খোকার অসুখে অজস্র খরচ করিয়া এই সময়ে কবি ভীষণ আর্থিক অভাবে পড়িয়াছিলেন। ডি. এম. লাইব্রেরীতে আসিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু লিখিয়া লাইব্রেরীর কর্মকর্তার নিকট হইতে কবি কিছু অর্থ লইয়া যাইতেন। অভাবের তাড়নায় এরূপ শোকতাপগ্রস্ত অবস্থায় কবি চন্দ্রবিন্দুর মত অপূর্ব হাস্যরসের কার্য রচনা করিয়াছেন। যদি তিনি মনের সুখে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' লিখিতে পারিতেন, তবে সেই লেখা আরও কত সুন্দর হইতে পারিত।

একদিন গ্রীষ্মকালে হঠাৎ কবি আমার পদ্মাতীরের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত। তিনি কেন্দ্রীয়-আইন সভার সভ্য হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন। এই উপলক্ষে ফরিদপুরে আসিয়াছেন প্রচারের জন্য। আমি হাসিয়া অস্থির : "কবিভাই, বলেন কি? আপনার বিরুদ্ধে এদেশে গোঁড়া মুসলিম-সমাজ কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ভোটযুদ্ধে তারাই হলেন সব চাইতে বড় সৈন্যসামন্ত। আমাদের সমাজ কিছুতেই আপনাকে সমর্থন করবে না।"

কবি তখন তার সুটকেস হইতে এক বাণ্ডিল কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখ, পীর বাদশা মিঞা আমাকে সমর্থন করে ফতোয়া দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের এত বড় বিখ্যাত পীর যা বলবেন, মুসলিম-সমাজ তা মাথা নিচু করে মেনে নেবে। জসীম, তুমি ভেবো না। নিশ্চয় সবাই আমাকে ভোট দেবে। ঢাকায় আমি শতকরা নিরানব্বই ভাগ ভোট পাব। তোমাদের ফরিদপুরের ভোট যদি আমি কিছু পাই, তা

হলেই কেল্লা ফতে। যদি নির্বাচিত হয়ে যাই—আর নির্বাচিত আমি তো হবই, মাঝে মাঝে আমাকে দিল্লী যেতে হবে। তখন তোমরা কেউ কেউ আমার সঙ্গে যাবে।”

রাতের অন্ধকারে আকাশে অসংখ্য তারা উঠিয়াছে। আমরা দুই কবিতে মিলিয়া তাদেরই সঙ্গে বুঝি প্রতিযোগিতা করিয়া মনের আকাশে অসংখ্য তারা ফুটাইয়া তুলিতেছিলাম।

কেন্দ্রীয় সভার ভোট-গ্রহণের আর মাত্র দুইদিন বাকী। ভোর হইলেই আমরা দুইজনে উঠিয়া ফরিদপুর শহরে মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তমিজউদ্দিন সাহেব আইনসভার নিম্ন-পরিষদের সভ্য পদের প্রার্থী ছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ফরিদপুরের তরুণ জমিদার বন্ধুবর লাল মিঞা সাহেব। আমরা লাল মিঞা সাহেবের সমর্থক ছিলাম। বাদশা মিঞা তমিজউদ্দিন সাহেবকে সমর্থন করিয়া ফতোয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস ছিল, তমিজউদ্দিন সাহেবের দল নিশ্চয়ই কবিকে সনর্থন করিবেন। কারণ বাদশা মিঞাও কবিকে সমর্থন করিয়া ইতিপুর্বে ফতোয়া দিয়াছেন। আর, লাল মিঞার দলে তো আমরা আছিই। সুতরাং সবাই কবিকে সমর্থন করিবে।

কবিকে সঙ্গে লইয়া যখন তমিজউদ্দিন সাহেবের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম, তমিজউদ্দিন সাহেব তাঁহার সমর্থক গুণগ্রাহীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া দরবার সাজাইয়া বসিয়াছিলেন। কবিকে দেখিয়া তাঁহারা সবাই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কবি যখন তাঁহার ভোটঅভিযানের কথা বলিলেন, তখন তমিজউদ্দিন সাহেবের একজন সভাসদ বলিয়া উঠিলেন, “তুমি কাফের। তোমাকে কোন মুসলমান ভোট দিবে না।”

তমিজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমাদের শত মতভেদ থাকিলেও তিনি বড়ই ভদ্রলোক। কবিকে এরূপ কথা বলায় তিনি বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কবি কিন্তু একটুও চটিলেন না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, “আপনারা আমাকে কাফের বলছেন, এর চাইতে কঠিন কথাও আমাকে শুনতে হয়। আমার গায়ের চামড়া এত পুরু যে আপনাদের তীক্ষ্ণ কথার বাণ তা ভেদ করতে পারে না। তবে আমি বড়ই সুখী হব, আপনারা যদি আমার রচিত দু-একটি কবিতা শোনেন।”

সবাই তখন কবিকে ঘিরিয়া বসিলেন। কবি আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। কবি যখন তাহার “মহরম” কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন, তখন যে ভদ্রলোক কবিকে কাফের বলিয়াছিলেন তারই চোখে সকলের আগে অশ্রুধারা দেখা দিল। কবি আবৃত্তি করিয়াই চলিয়াছেন—যে কাজে আমরা আসিয়াছি, সে দিকে তাঁর দৃষ্টি নাই। আমি কবির কানে কানে বলিলাম, “এইবার আপনার ইলেকসনের কথা ওঁদের বলুন।”

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে! কবি আবৃত্তি করিয়াই চলিয়াছেন। তখন আমি মরিয়া হইয়া সবাইকে শুনাইয়া বলিলাম, “আপনারা কবির কবিতা শুনছেন—এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু কবি একটি বড় কাজে এখানে এসেছেন। আসন্ন ভোট-সংগ্রামে কবি আপনাদের সমর্থন আশা করেন। এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করুন।”

তমিজউদ্দিন সাহেব চালাক লোক। কবিতা আবৃত্তি করিয়া কবি তাঁহার সমর্থক ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তিনি যে কবিকে সমর্থন করিবেন না, এই আলোচনা তিনি তাঁহাদের সকলের সামনে করিলেন না। কবিকে তিনি আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। পাঁচ-ছয় মিনিট পরে হাসিমুখেই তাহারা দুইজনে আসরে ফিরিয়া

আসিলেন। আসিয়া কবি আবার পূর্ববৎ কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। আমি ভাবিলাম, কেল্লা ফতে! কবির হাসিমুখ দেখিয়া এবং আবার আসিয়া তাহাকে কবিতা আবৃত্তি করিতে দেখিয়া ভাবিলাম, নিশ্চয়ই তমিজউদ্দিন সাহেবের দল কবিকে সমর্থন করিবে।

কবি আবৃত্তি করিয়াই চলিয়াছেন। বেলা দুইটা বাজিল। কবির সে দিকে হুশ নাই। কবির শ্রোতারাই এ বিষয়ে কবিকে সজাগ করিয়া দিলেন। কবি তাহার কাগজপত্র কুড়াইয়া লইয়া বিদায় হইলেন। তাদের মধ্য হইতে একটি লোকও বলিলেন না, এত বেলায় আপনি কোথায় যাইবেন, আমাদের এখান হইতে খাইয়া যান। আমার নিজের জেলা ফরিদপুরের এই কলঙ্ক-কথা বলিতে লজ্জায় আমার মাথা নত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা না বলিলে, সেই যুগে আমাদের সমাজ এত বড় একজন কবিকে কি ভাবে অবহেলা করিতেন, তাহা জানা যাইবে না। অথচ এদেরই দেখিয়াছি, আলেম-সমাজের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা! কত গরীব ছাত্রকে তমিজউদ্দিন সাহেব অন্নদান করিয়াছেন!

দুইটার সময় তমিজউদ্দিন সাহেবের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ভাবিলাম, এখন কোথায় যাই। আমার বাড়ি শহর হইতে দুই মাইলের পথ; হাঁটিয়া যাইতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগিবে। পৌঁছিতে তিনটা বাজিবে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আজ আর শহরে ফিরিয়া কাজকর্ম করা যাইবে না। স্থির করিলাম, বাজারে কোন হোটলে খাওয়া সারিয়া অন্যান্য স্থানে ভোট-সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করিব।

পথে আসিতে আসিতে কবিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তমিজউদ্দিন সাহেবের দল আমাদের সমর্থন করিবে। এবার তবে কেল্লা ফতে!"

কবি উত্তর করিলেন, “না রে, ওঁরা বাইরে ডেকে নিয়ে আমাকে আগেই খুলে বলে দিয়েছেন, আমাকে সমর্থন করবেন না। ওঁরা সমর্থন করবেন বরিশালের জমিদার ইসমাইল সাহেবকে।”

তখন রাগে দুঃখে কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। রাগ করিয়াই কবিকে বলাম, “আচ্ছা কবিভাই, এই যদি আপনি জানলেন, তবে ওঁদের কবিতা শুনিয়ে সারাটা দিন নষ্ট করলেন কেন?”

কবি হাসিয়া বলিলেন, “ওরা শুনতে চাইলে, শুনিয়ে দিলুম।”

এ কথার কী আর উত্তর দিব? কবিকে লইয়া হোটলের সন্ধানে বাহির হইলাম। তখনকার দিনে ফরিদপুর শহরে ভাল হোটেল ছিল না। যে হোটেলে যাই, দেখি মাছি ভনভন করিতেছে। ময়লা বিছানা-বালিশ হইতে নোংরা গন্ধ বাহির হইতেছে। তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটি পরিষ্কার হোটেল বাছিয়া লইয়া কোন রকমে ভোজনপর্ব সমাধা করিলাম।

শ্রেষ্ঠ কবিকে আমার দেশ এই সম্মান জানাইল। এই জন্যই বুঝি আধুনিক মুসলিম-সমাজে বড় লেখক বা বড় কবির আগমন হয় নাই। মিশর, তুরস্ক, আরব—কোন দেশেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকের উদয় হইতেছে না। অথচ ইসলামের আবির্ভাবের প্রারম্ভে আমাদের সমাজে কত বিশ্ববরেণ্য মহাকবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। হাফিজ, রুমী, সানী, ওমর খৈয়াম—এদের লেখা পড়িয়া জগৎ মোহিত। কিন্তু আজ কি দেখিতেছি? সমস্ত মুসলিম-জগতে কোথা হইতেও প্রতিভার উদয় হইতেছে না। প্রতিভাকে বড় ও

পুষ্ট করিয়া তুলিবার মত মানসিকতা আমাদের সমাজ-জীবন হইতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বনে জঙ্গলে আগাহার অন্তরালে বহু ফুল ফুটিয়া থাকে। কে তাহাদের সন্ধান রাখে? ফুলের বাগান করিতে হইলে উপযুক্ত মালির প্রয়োজন; ফুলগাছের তদ্বির-তালাসী করিবার প্রয়োজন। গাছের গোড়া হইতে আগাছা নষ্ট করিয়া দিতে হয়; গোড়ায় পানি ঢালিতে হয়। তবেই ফুলের গাছে ফুল ফোটে, সেই ফুলের গন্ধে দুনিয়া মাতোয়ারা হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে যদি ভুলেও দু-একটা ফুলগাছ জন্মে, আমরা গোড়ায় পানি ঢালা তো দূরের কথা, কুঠার লইয়া তাহাকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হই। নজরুল-জীননের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তারা সকলেই এ কথার সাক্ষ্যদান করিবেন। নজরুলের কবিজীবনের আবির্ভাবের সময় আমাদের সমাজ যে কুৎসিত ভাষায় কবিকে আক্রমণ করিয়াছেন, যে ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাহার কণ্টক-ক্ষতগুলি মহাকাল কবির কাব্যের সঙ্গে বহন করিয়া চলিবে। অনাগত যুগের কাব্য-রসগ্রাহীদের কাছে আমরা এইজন্য হেয় হইয়া থাকিব।

যাক এসব কথা। কবি কিন্তু আসন্ন ভোটযুদ্ধে বড়ই আশাবাদী ছিলেন। আমি লোক-চরিত্র কিছুটা জানিতাম; আমাদের সমাজের মানবিকতার কথাও অবগত ছিলাম। তাই কবির মনকে আগে হইতেই পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিবার জন্য তৈরি রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু সবই বৃথা। পীর বাদশা মিঞার সমর্থন-চিঠি তিনি পাইয়াছেন। আরও বহু মুসলিম নেতা কবিকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মুসলিম-সমাজের কাগজগুলি বহুদিন হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে বিষেশার করিতেছিল, তাহার ধাক্কায় শত বাদশা মিঞা ভাসিয়া যাইবেন—এই বয়স্ক-শিশুকে তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব?

প্রথম ভোটের দিন কবিকে ভোটগ্রাহক অফিসারের সামনে বসাইয়া দিলাম। কবির সামনে গিয়া ভোটারেরা ভোট দিবেন। মনে একটু ভরসা ছিল, কবিকে সামনে দেখিয়া ভোটারেরা হয়তো তাহাকে সমর্থন করিবেন। কবি সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া আমাকে বললেন, বহু লোক তাহাকে ভোট দিয়াছেন; তাঁহাদের মুখ দেখিয়াই নাকি কবি ইহা বুঝিতে পারিলেন। পরদিন সকালে আমরা নদীতে গোসল করিতে চলিয়াছি। কবি আমাকে বলিলেন, "দেখ জসীম, ভেবে দেখেছি, এই ভোটযুদ্ধে আমার জয় হবে না। আমি ঢাকা চলে যাই। দেখি, অন্ততপক্ষে জামানতের টাকাটা যাতে মারা না যায়।"

তখন বড়ই হাসি পাইল। জয়ী হইবেন বলিয়া কাল যিনি খুশীতে মশগুল ছিলেন, হারিয়া গিয়া জামানতের টাকা মার যাওয়ার চিন্তা আজ ওঁহার মনে কোথা হইতে আসিল। ব্যবহারিক জীবনে এই বয়স্ক শিশুটির সারা জীবন ভরিয়া এমনই ভুল করিয়া প্রতি পদক্ষেপে নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হইয়াছেন।

দুপুরের গাড়ীতে কবি চলিয়া গেলেন। মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। হঠাৎ এমন করিয়া কবির সাহচর্য হইতে বঞ্চিত হইব, তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

একবার পরলোকগত সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে কবি আর হেমন্তকুমার সরকার আমাদের ফরিদপুরে আসিলেন। সরোজিনী নাইডু একদিন পরেই চলিয়া গেলেন। কবিকে আমরা কয়েকদিন রাখিয়া দিলাম।

আমি তখন ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে পড়ি। আমরা সকল ছাত্র মিলিয়া কবিকে কলেজে আনিয়া অভিনন্দন দিব, স্থির করিলাম। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল কামাখ্যাচরণ মিত্র মহাশয় খুশী। হইয়া আমাদের প্রস্তাবে রাজি হইলেন।

খবর পাইয়া ফরিদপুরের পুলিশ-সাহেব আমাদের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলেন, নজরুলের মতিগতি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে; তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সরলমতি ছাত্রদিগকে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিবেন। নজরুলকে যদি কলেজে বক্ত তা করিতে দেওয়া হয়, তবে সি. আই. ডি. পুলিশদেরও কলেজের সভায় উপস্থিত থাকিতে দিতে হইবে। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল কামাখ্যা বাবুর প্রতিও গভর্নমেন্টের মুনজর ছিল না। বহু বৎসর আগে তিনি পুলিশের কোপদৃষ্টিতে অন্তরীণ ছিলেন। নজরুলকে দিয়া বক্তৃতা করাইলে পরিণামে কলেজের ক্ষতি হইতে পারে বিবেচনা করিয়া তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, “নজরুলকে লইয়া কলেজে যে সভা করার অনুমতি দিয়েছিলাম, তাহা প্রত্যাহার করলাম।”

আমরা মুষড়িয়া পড়িলাম। সবাই মুখ মলিন করিয়া কবির কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের অবস্থা দেখিয়া কবি বলিলেন, “কুছ পরওয়া নেই। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে সভা কর। আমি সেইখানে বক্তৃতা দেব।”

তখন আমাদিগকে আর পায় কে! দশ-বিশটা কেরোসিনের টিন বাজাইতে বাজাইতে সমস্ত শহর ভরিয়া কবির বক্তৃতা দেওয়ার কথা প্রচার করিলাম। সন্ধ্যাবেলা অম্বিকা-হলের ময়দান লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার নর-নারী আসিয়া জমায়েত হইলেন কবি-কণ্ঠের বাণী শুনিবার জন্য।

সেই সভায় কবিকে নূতনরূপে পাইলাম। এতদিন কবি শুধু দেশাত্মবোধের কথাই বলিতেন। আজ কবি বলিলেন সাম্যবাদের বাণী। কবি যখন 'উঠ রে চাষী জগৎবাসী, ধর কষে লাঙ্গল' অথবা 'আমরা শ্রমিকদল, ওরে আমরা শ্রমিকদল'—প্রভৃতি গান গাহিতেছিলেন, তখন সমবেত জনতা কবির ভাব-তরঙ্গের সঙ্গে উদ্বেলিত হইতেছিল। সর্বশেষে কবি তাহার বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতা আবৃত্তি করিলেন। সে কী আবৃত্তি, প্রতিটি কথা কবির কণ্ঠের অপূর্ব ভাবচ্ছটায় উদ্বেলিত হইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গিয়া ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, কবিকণ্ঠ হইতে যেন অগ্নি-বর্ষণ হইতেছে। সেই আগুনে যাহা কিছু ন্যায়ের বিরোধী, সমস্ত পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সেই সভায় আমি বলিয়াছিলাম, ইনি আমাদের কবি; ইহার অন্তর হইতে যে বাণী বাহির হইতেছে, সেই বাণীর সঙ্গে আমাদের যুগান্তরের দুঃখ-বেদনা ও কান্না মিশ্রিত হইয়া আছে; শত জালিমের অত্যাচারে শত শোষকের পীড়নে আমাদের অন্তরে যে অগ্নিময় হাহাকার শত লেলিহ জিহবা মিলিয়া যুগ-যুগান্তরের অপমানের গ্লানিতে তাপ সঞ্চয় করিতেছিল, এই কবির বাণীতে আজ তাহা রূপ পাইল। এই কবির অন্তর হইতে বাণীর বিহঙ্গের অগ্নির পাখা বিস্তার করিয়া আজ দিগ-দিগন্তে সর্বত্যাগের গান গাহিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। কাব্য এই কবির কাছে ভাব-বিলাসের বস্তু নয়। তাহার কাব্যলোক হইতে যে বাণী স্বতঃই উৎসারিত হইতেছে, নিজের জীবনকে ইনি সেই বাণী-নিঃসৃত পথে পরিচালিত করিতেছেন। আমাদের আসমানে, সুবেহ সাদেকে ইনি উদীয়মান শুকতারা। উহার ত্যাগের রক্তরঙ্গিমায় স্নান করিয়া নূতন প্রভাতের অরুণ আলোক দিগদিগন্ত আলোকিত করিয়া তুলিবে।

আমার বক্তৃতার শেষের দিকে আমি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলাম। পরদিন তিনি আমাকে ডাকাইয়া ইহার জন্য কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি, তারই জোরে সভায় আপনার বিরূপ সমালোচনা করতে সাহসী হয়েছিলাম। আপনিই তো বলে থাকেন, আমরা রাজভয়ে ন্যায়ের পথ হতে বিচ্যুত হব না। কিন্তু পুলিশ-সাহেবের একখানা পত্র পেয়ে আপনি আপনার পুর্ব-অনুমতি ফিরিয়ে নিলেন।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। বুঝিলাম, তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার মত ক্ষমাসুন্দর শিক্ষক জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি।

ইহার পরে আরও একবার কবি আমার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমাদের নদী-তীরের বাঁশঝাড়ের ছায়াতলে বসিয়া আমরা দু'টি কবি মিলিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির রহস্যদেশ হইতে মনি মাণিক্য কুড়াইয়া আনিব। কবিও তাহাতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু ফরিদপুরের তরুণ জমিদার বন্ধুবর লাল মিঞা সাহেব মোটর হাঁকাইয়া আসিয়া একদিন কবিকে শহরে লইয়া আসিলেন। আমার নদীতীরের চখা-চখির ডাকাডাকি কবিকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

বাঁশঝাড়ের যে স্থানটিতে কবির বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছিলাম, সেই স্থান শূন্য পড়িয়া রহিল। চরের বাতাস আছাড়িবিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার নদীতীরের কুটিরে কবির এই শেষ আগমন।

একদিন রাত্রে বন্ধুবর লাল মিঞার বাড়িতে আমরা তিন-চার জন মিলিয়া কবির সঙ্গে গল্প করিতে বসিলাম। কবি ভাল কবিতা লেখেন, ভাল বক্তৃতা দেন, ভাল গান করেন—তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু মজলিসে বসিয়া যিনি কবির গালগল্প না শুনিয়াছেন, তাহারা কবির সব চাইতে ভাল গুণটির পরিচয় পান নাই। অনেক বড় বড় লোকের মজলিসে কবিকে দেখিয়াছি। মজলিসি গল্পে বিখ্যাত দেশবরেণ্য নেতা ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে কবিকে দেখিয়াছি; সেখানেও একমাত্র কথক কবি—আর সকলেই শ্রোতা। কথায় কথায় কবির সে কী উচ্চ হাসি! আর সেই হাসির তুফানে আশেপাশের সমস্ত লোক তাঁর হাতের পুতুলের মত একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে। কিন্তু এইদিন রাত্রে কবিকে যেন আরও নূতন করিয়া পাইলাম। কবির মুখে গল্প শুনিতে শুনিতে মনে হইল, কবির সমস্ত দেহটি যেন এক বীণার যন্ত্র। আমাদের দু-একটি প্রশ্নের মৃদু করাঘাতে সেই বীণা হইতে অপূর্ব সুরঝঙ্কার বাহির হইতেছে। কবি বলিয়া যাইতেছেন তাহার সমস্ত জীবনের প্রেমের কাহিনী। বলিতে বলিতে কখনও কবি আমাদের দুই চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছেন আবার কখনও আমাদিগকে হাসাইয়া প্রায় দম বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়া তুলিতেছেন। সেসব গল্পের কথা আজো বলিবার সময় আসে নাই।

গল্প শুনিতে শুনিতে শুনিতে কোন দিক দিয়া যে ভোর হইয়া গেল, তাহা আমরা টের পাইলাম না। সকালবেলা আমরা কবিকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

একবার কবিকে আর একটি সভায় খুব গল্পমুখর দেখিয়াছিলাম। কবির এক গানের শিষ্য পুষ্পলতা দে'র জন্মদিনে। সেই সভায় জাহানারা বেগম, তাঁহার মা, কবির শাশুড়ী এবং কবি-পত্নী উপস্থিত ছিলেন।

আমরা সকলে খাইতে বসিয়াছি। ছোট ছোট মাটির পাত্রে করিয়া নানা রকম খাদ্যবস্তু আমাদের সামনে আসিয়া দেওয়া হইতেছে। কবি তার এক একটি দেখাইয়া বলিতেছেন—এটি খুড়ীমা, এট পিসীমা, এটি মাসীমা।

আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা কবিভাই, সবাইকে দেখালেন—আমার ভাবী কোটি, তাকে তো দেখালেন না।"

কবি একটুও চিন্তা না করিয়া পানির গেলাসটি দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এইটি তোমাদের ভাবী । যেহেতু আমি তার পাণিগ্রহণ করেছি।"

চারিদিকে হাসির তুফান উঠিল। ভাবী হাসিয়া কুটিকুটি হইলেন। কোন রকমে হাসি থামাইয়া আমরা আবার আহারে মনোনিবেশ করিয়াছি, অমনি কবি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন : "জসীম, তুমি লুচি খেও না।"

বাড়ীর গৃহিণীর মুখ ভার। না জানি লুচির মধ্যে কবি কোন ত্রুটি পাইয়াছেন।

আমি উত্তর করিলাম, "কেন কবিভাই?" সকলেই ভোজন ছাড়িয়া কবির দিকে চাহিয়াছিলেন।

কবি বলিয়া উঠিলেন, "যেহেতু আমরা বেলুচিস্তান হতে এসেছি, সুতরাং লুচি খেতে পারব না।"

চারিদিকে আবার হাসির চোটে অনেকেরই খাদ্যবস্তু গলায় আটকাইয়া যাইতেছিল।

বাড়ীর গৃহিণী কৃত্রিম গলবস্ত্র হইয়া কবিকে বলিলেন, “বাবা নুরু, লক্ষ্মীটি, তুমি একটু ক্ষণের জন্য হাসির কথা বন্ধ কর। এদের খেতে দাও।”

আগেই বলিয়াছি, বিষয়বুদ্ধি কবির মোটেই ছিল না। একবার কবির বাড়ি গিয়া দেখি, খালাআম্মা কবিকে বলিতেছেন, “ঘরে আর একটিও টাকা নেই। কাল বাজার করা হবে না।”

কবি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন তাঁর গ্রন্থ-প্রকাশকের দোকানে। পথে আসিয়া কবি ট্যাক্সি ডাকিলেন। কলেজ ষ্টীটের কাছে আসিয়া আমাকে ট্যাক্সিতে বসাইয়া রাখিয়া চলিলেন কলেজ ঈটি মার্কেটের দ্বিতল কক্ষে “আর্যস্থান পাবলিশিং হাউসে টাকা আনিতে। প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কবির দেখা নাই। এদিকে ট্যাক্সিতে মিটার উঠিতেছে। যত দেরী হইবে, কবিকে তত বেশী ট্যাক্সী ভাড়া দিতে হইবে। বিরক্ত হইয়া আমি উপরে উঠিয়া গেলাম। দেখি, কবি প্রকাশকের সঙ্গে একথা-ওকথা লইয়া আলাপ করিতেছেন। আসল কথা—অর্থাৎ টাকার কথা সেই গল্পের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কবির কানে কানে আমি সমঝাইয়া দিলাম, কিন্তু কবির সেদিকে খেয়াল নাই তখন রাগত ভাবেই বলিলাম, “ওদিকে ট্যাক্সির মিটার উঠছে, সেটা মনে আছে?” কবি তখন প্রকাশকের কানে কানে টাকার কথা বলিলেন।

প্রকাশক অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া কবির হাতে পাঁচটি টাকা দিলেন। অল্পে তুষ্ট কবি মহাখুশী হইয়া তাহাই লইয়া গাড়ীতে আসিলেন। দেখা গেল, গাড়ীর মিটারে পাঁচ টাকা উঠিয়াছে। ট্যাক্সিওয়ালাকে তাহাই দিয়া কবি পায়ে হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কবিকে কত ভাবে কত জায়গায় দেখিয়াছি! যখন যেখানে তাহাকে দেখিয়াছি, স্ব-মহিমায় তিনি সমুজ্জ্বল। বড় প্রদীপের কাছে আসিয়া ঘোট প্রদীপের যে অবস্থা আমার তাহাই হইত। অথচ পরের গুণপনাকে এমন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে নজরুলের মত আর কাহাকেও দেখি নাই। অপর কাহাকেও প্রশংসা করিতে পারিলে তিনি যেন কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। অপরকে হেয় করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি কোনদিনই প্রয়াস পান নাই। কবি যখন গানের আসরে আসিয়া বসিয়াছেন, সেখানে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। গায়ক। সকলেই তার গান শুনিতে চাহিতেন। হয়তো বা সেই সভায় কবির চাইতেও অনেক সুকণ্ঠ গায়ক বর্তমান। তেমনি গল্পের আসরে, সাহিত্যের মজলিসে, রাজনৈতিক বক্তৃতার মঞ্চে—সব জায়গায় সেই এক অবস্থা। ইহার একমাত্র কারণ স্বাভাবিক গুণপনা তো কবির ছিলই, তার সঙ্গে ছিল তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের কাছে স্বেচ্ছায় সকলে নত হইয়া পড়িল। তবু এই লোকের শত্রুর অন্ত ছিল না। দেশ-জোড় প্রশংসা শুনিয়া তাহারা ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। কাগজে নানারূপ ব্যঙ্গরচনা করিয়া তাহারা কবিকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইত। কবি প্রয়ই সেদিকে খেয়াল করিতেন না। যদিই বা তাহাদের কামড়ে উত্ত্যক্ত হইয়া কখনো কখনো কবি দু-একটি বাক্যবাণ ছুঁড়িয়াছেন, কবির রচনার জাদুর স্পর্শে তাহা বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

নজরুলের জীবন লইয়া অনেক চিন্তা করিয়া দেবিয়াছি। এই লোকটি আশ্চর্য লোকরঞ্জনের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই যেখানে গিয়াছেন, যশ অর্থ সম্মান আপনা হইতেই আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে সত্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত—কবিতা রচনা করিয়া সেকালে অর্থ উপার্জন করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের বহু পুস্তকের তখন দ্বিতীয় সংস্করণ হইত না। মাসিক পত্রিকার সম্পাদক কবিদের কবিতার জন্য অর্থ তত দিতেনই না—যে সংখ্যায় কবির কবিতা ছাপা হইত, সেই সংখ্যাটি পর্যন্ত কবিকে কিনিয়া লইতে হইত। নজরুলই বোধ হয় বাংলার প্রথম কবি, যিনি কবিতা লিখিয়া মাসিক পত্রিকা হইতেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন।

আগে গ্রামোফোনের জন্য যাহারা গান রচনা করিতেন, গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকট হইতে তাহাদের খুব কম লোকই রচনার মূল্য আদায় করিতে পারিতেন। নজরুল গ্রামোফোনেয় গান রচনা করিয়া শুধু নিজের গানের জন্যেই পারিশ্রমিক আদায় করিলেন না; তাহার আগমনের পর হইতে সকল লেখকই রচনার জন্য উপযুক্ত মূল্য পাইতে লাগিলেন। নজরুল প্রমাণ করিলেন, গানের রেকর্ড বেশী বিক্রয় হয়—সে শুধু গায়কদের সুকণ্ঠের জন্যই নয়, সুন্দর রচনার সহিত সুন্দর সুন্দরের সমাবেশ রেকর্ড বিক্রয়-বাড়াইয়া দেয়। নজরুলের আগমনের পর হইতে গ্রামোফোন কোম্পানী আরও নূতন নূতন রচনাকারীর সন্ধানে ছুটিল, নূতন নূতন সুরসংযোজন কারীর খোঁজে বাহির হইল। নজরুলের রচনা আর সুর লইয়া তাহারা বুঝিতে পরিল, সুন্দর কথার সঙ্গে সুন্দর সুরের সমাবেশ হইলে সেই গান বেশি লোকপ্রিয় হয়। গ্রামোফোনকোম্পানীতে আজ যে এত কথাকার আর এত সুরকার গুঞ্জরণ করিতেছেন, এ শুধু নজরুলের জন্য। একথা কি তাঁহারা কেহ আজ স্বীকার করিবেন?

একটি গান রচনা করা অনেক সময় একটি মহাকাব্য রচনার সমান। মহাকাব্যের লেখক সুবিস্তৃত কাহিনীর পদক্ষেপের মধ্যে আপনার ভাব রূপায়িত করিবার অবসর পান। গানের লেখক মহাকাব্য রচনা করেন অতি-সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া। মহাকাব্যের পাঠক বার বার সেই কাব্য পাঠ করেন না; করিলেও সেই কাব্যের ত্রুটি-

বিচ্যুতির সন্ধান সহজে পান না। কিন্তু গানের সমঝদার গানটিকে বার বার করিয়া আবৃত্তি করিয়া সেই গানের পুঙ্খানুপুঙ্খ ত্রুটিবিচ্যুতি ও গুণের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই জন্য একটি ভাল গান রচনা করা প্রায় একটি মহাকাব্য রচনার মতই কঠিন। নজরুলের বেলায় দেখিয়াছি, গান রচনা তাঁহার পক্ষে কত সহজ ছিল। তিনি যেন গান রচনা করেন নাই, বালকের মত পুতুল লইয়া খেলা কয়িয়াছেন। সুরগুলি পাখির মত সহজেই তাহার কথার জালে আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রামোফোন-কোম্পানীতে গিয়া বহুদিন কবিকে গান রচনা করিতে দেখিয়াছি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! এঘরে-ওঘরে গায়কেরা নানা রাগ-রাগিণী ভাজিয়া সুরাসুরের লড়াই বাধাইয়া তুলিয়াছেন, কানে তালা লাগিবার উপক্রম। মাঝখানে কবি বসিয়া আছেন হারোমমানিয়াম সামনে লইয়া। পার্শ্বে অনেকগুলি পান, আর পেয়ালা-ভরা গরম চা। ছয়-সাত জন গায়ক বসিয়া আছেন কবির রচনার প্রতীক্ষায়। একজনের চাই দুইটি শ্যামাসঙ্গীত, অপরের চাই একটি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কীর্তন, একজনের চাই দুইটি ইসলামী সঙ্গীত, অন্যজনের চাই চারিটি ভাটিয়ালী গান, আর একজনের চাই আধুনিক প্রেমের গান। এরা যেন অঞ্জলি পাতিয়া বসিয়া আছেন। কবি তাহার মানস-লোক হইতে সুধা আহরণ করিয়া আনিয়া তাহাদের করপুট ভরিয়া দিলেন।

কবি ধীরে ধীরে হারমোনিয়াম বাজাইতেছেন, আর গুনগুন করিয়া গানের কথাগুলি গাহিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে থামিয়া কথাগুলি লিখিয়া লইতেছেন। এইভাবে একই অধিবেশনে সাতআটটি গান শুধু রচিত হইতেছে না—তাহারা সুর সংযোজিত হইয়া উপযুক্ত শিষ্যের কণ্ঠে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। কবির কাব্যের মধ্যে বহু স্থানে বাজে উচ্ছ্বাস ও অসংযমের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু গানের স্বল্পপরিসর আয়তনের মধ্যে

আসিয়া কবির রচনা যেন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কবি যেন তাহার গানের ক্ষুদ্র কৌটার মধ্যে মহাকাশের অনন্ত রহস্য পুরিয়া দিয়াছেন। সেই গান যতই গাওয়া যায়, তাহা হইতে ততই মাধুর্যের ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হইতে থাকে। কবির যে গানে রচনার মাধুর্য পাওয়া যায় না, সুরের মাধুর্য সেখানে রচনার দৈন্য পূরণ করে। কবি যখুন সাহিত্য করিয়াছেন, সেই সাহিত্যকে তিনি জনসাধারণের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

সাহিত্য করিতে করিতে কবি যখন জেলে গেলেন, সেখানেও আত্মসম্মানের মহিমা লইয়া কবি সমস্ত দেশের অন্তর জয় করিয়াছেন। চল্লিশ দিন ব্যাপী অনশনের সুদীর্ঘ বন্ধুর পথে এই নির্ভীক সেনানীর প্রতি পদক্ষেপ তাঁহার দেশবাসীর অন্তর উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। ইদানীং রোগের শর-শয্যায় শয়ন করিয়া কবি দেশবাসীর অন্তরে আরও সমুজ্জল হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

কবিকে আমি শেষ বার সুস্থ অবস্থায় দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুনিলাম মুসলিম-হলে কবি আসিবেন ভোর আটটায়। কিন্তু কবি আসিলেন বেলা দশটায়। সময়-অনুবর্তিতার জ্ঞান কবির কোনদিনই ছিল না। নোঙরহীন নৌকার মত তিনি ভাসিয়া বেড়াইতেন। সেই নৌকায় যে-কেহ আসিয়া হাল ঘুরাইয়া কবির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত। এক জায়গায় যাইবার জন্য তিনি যাত্রা করিলেন, তাহার গুণগ্রাহীরা তাহাকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য স্থানে লইয়া গেলেন। এজন্য কবিকেই আমরা দায়ী করিয়া থাকি। যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া যাহারা কবিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাঁহারা

কোনদিনই দায়ী হইতেন না। শিশুর মত আপন-ভোলা কবিকে সে জন্য কত লোকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে।

আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে দেখিয়া কবি কত সুখী হইলেন। তিনি আমার কানে কানে বলিলেন, "মায়েরা ছেলেদের প্রতি যে স্নেহ-মমতা ধারণ করে, তোমার চোখে-মুখে সমস্ত অবয়বে সেই স্নেহ-মমতার ছাপ দেখতে পেলাম।"

কবি আসিয়াই তাহার স্বভাবসিদ্ধ রূপে ছেলেদের সামনে কবিতাগান আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আমার ক্লাস ছিল, ঘণ্টাখানেক থাকিয়া আমি চলিয়া গেলাম।

দুপুরবেলা ক্লাস করিতেছি, দেখিলাম ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। মেয়েরা সবাই অনুপস্থিত। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, ফজলুল হক হলে নজরুল আসিয়াছেন। সবাই তাহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছে। বেলা তিনটার সময় ফজলুল হক-হলে গিয়া দেখি, ছেলে-মেয়েদের চাহিদা অনুসারে কবি গানের পর গান গাহিয়া চলিয়াছেন, কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন। কবির মুখ শুষ্ক; সমস্ত অঙ্গ ক্লান্তিতে ভরা। খোঁজ লইয়া জানিলাম— সেই যে সকাল দশটায় কবি আসিয়াছেন, বারোটা পর্যন্ত মুসলিমহলে থাকিয়া তারপর ফজলুল হক-হলে আগমন করিয়াছেন—ইহার মধ্যে কয়েক পেয়ালা চা আর পান ছাড়া কিছুই কবিকে খাইতে দেওয়া হয় নাই। আমার তখন কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। এই অবুঝ বয়স্ক-শিশুটিকে লইয়া ছেলেরা কী নিষ্ঠুর খেলাই না খেলিতেছে! কিন্তু অবেলায় কোথাও কিছু খাবার পাইবার উপায় ছিল না। আমি এক রকম জোর করিয়াই সভা ভাঙিয়া দিলাম। খাওয়ার ব্যাপারটা আমি যে এত বড় করিয়া

ধরিয়াছি, এজন্য কবি খুব খুশী হইলেন না। দোকান হইতে সামান্য কিছু খাবার আনাইয়া বহু সাধ্যসাধনায় কবিকে খাওয়ান গেল।

সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করিবার সময় আমি কবির বাক্যের ভিতরে কতকটা প্রলাপ-উক্তির আভাস পাইয়াছিলাম। এক জায়গায় কবি বলিয়া ফেলিলেন, "আমি আল্লাকে দেখেছি। কিন্তু সে সব কথা বলবার সময় এখনও আসে নাই। সে সব বলবার অনুমতি যেদিন পাব, সে দিন আবার আপনাদের সামনে আসব।"

ইহার কিছুদিন পরেই শুনিলাম, কবি পাগল হইয়া গিয়াছেন। অসুস্থ অবস্থায় কবিকে দেখিবার জন্য বহুবার কবি-গৃহে গমন করিয়াছি। আগে তিনি আমাকে দেখিলে চিনিতে পারিতেন; আমার আব্বা কেমন আছেন, ছেলেরা কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন আর চিনিতে পারেন না। কবির কোন কবিতা আবৃত্তি করিলে কবি বড়ই সুখী হন। কিছু খাইতে দিলে খুশী হইয়া গ্রহণ করেন।

কবির শাশুড়ী খালাআম্মার বিষয়ে আমাদের সমাজে প্রচুর বিরূপ আলোচনা হইয়া থাকে। এই নিরপরাধ মহিলার বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিব।

একদিন বেলা একটার সময় কবি-গৃহে গমন করিয়া দেখি, খালআম্মা বিষণ্ণ বদন বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার মুখ আজ বেজার কেন?"

খালাআম্মা বলিলেন, "জসীম, তোমারা জান, সব লোকে আমার নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। নুরুর নামে যেখান থেকে যত টাকা-পয়সা আসে, আমি নাকি সব বাক্সে বন্ধ করে রাখি। নুরুকে ভালমত খাওয়াই না, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি না। তুমি জান, আমার ছেলে

নেই; নুরুকেই আমি ছেলে করে নিয়েছি। আর, আমিই বা কে! নুরুর দু'টি ছেলে আছে—তারা বড় হয়ে উঠেছে। আমি যদি শুরুর টাকা লুকিয়ে রাখি, তারা তা সহ্য করবে কেন? তাদের বাপ খেতে পেল কিনা, তারা কি চোখে দেখে না। নিজের ছেলের চাইতে কি কবির প্রতি অপরে: দরদ বেশী? আমি তোকে বলে দিলাম, জসীম এই সংসার থেকে একদিন আমি কোথাও চলে যাব। এই নিন্দা আমি সহ্য করতে পারি নে।"

এই বলিয়া খালাআম্মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "খালাআম্মা, কাঁদবেন না একদিন সত্য উদঘাটিত হইবেই।"

খালাআম্মা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, যে ঘরে নজরুল থাকিতেন সেই ঘরে। দেখিলাম, পায়খানা করিয়া কাপড়-জামা সমস্ত অপরিষ্কার করিয়া কবি বসিয়া আছেন। খালাআম্মা বলিলেন, "এই সব পরিষ্কার করে স্নান করে আমি হিন্দু-বিধবা তবে রান্না করতে বসব। খেতে খেতে বেল পাঁচটা বাজবে। রোজ এই ভাবে তিন-চার বার পরিষ্কার করতে হয়। যারা নিন্দা করে তাদের বোললা, তারা এসে যেন এই কাজের ভার নেয়। তখন যেখানে চক্ষু যায়, আমি চলে যাব।" তখন বুঝতে পারি নাই, সত্য সত্যই খালা-আম্মা ইহা করিবেন।

ইহার কিছুদিন পরে খালাআম্মা সেই যে কোথায় চলিয়া গেলেন, কিছুতেই তাহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই। আজ দুই-তিন-বৎসরের উপরে খালা-আম্মা উধাও। কবির দুই পুত্র কত স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতেছে, তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।

দু-একজন কৃত্রির নজরুল-ভক্তের মুখে আজও খালাআম্মার নিন্দা শোনা যায়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, “নজরুলের টাকা সমস্ত তার শাশুড়ীর পেটে।” বিনা অপরাধে এরূপ শাস্তি পাইতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। রক্ষণশীল হিন্দু-ঘরেব এই বিধবা নিজের মেয়েটির হাত ধরিয়া একদিন এই প্রতিভাধর ছন্নছাড়া কবির সঙ্গে অকূলে ভাসিতেছিলেন। নিজের সমাজের হাতে আত্মীয়-স্বজনের হাতে সেদিন তাহার গঞ্জনার সীমা ছিল না। সেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে তিনি তৃণের মত পদতলে দলিত করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী নিন্দা অন্য ধরনের। এই নিন্দা তিনি সহ করিতে পারিলেন না।

খালাআম্মা আজ বাঁচিয়া আছেন কিনা জানি না, ইহলোকে বা পরলোকে যেখানেই থাকুন, তিনি যেন তার এই পাতান বোনপোটির একফোটা অশ্রুজলের সমবেদনা গ্রহণ করেন। মুহূর্তের জন্যও যেন একবার স্মরণ করেন, ভাল কাজ করিলে তাহা বৃথা যায় না। খালাম্মার সেই নীরব আত্মত্যাগ অন্তত পক্ষে একজনের অন্তরের বীণায় আজও মধুর সুরলহরে প্রকাশ পাইতেছে।

আমার ভাবী সাহেবার কথা আর কি বলিব! কত সীমাহীন দুঃখের সাগরেই না তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন! অর্ধাঙ্গ হইয়া তিনি বিছানা হইতে উঠিতে পারেন না। তবু মুখে সেই মধুর হাসিটি যে হাসি সেই প্রথম বধূজীবনে তাঁহার মুখে দেখিয়াছিলাম। যে হাসিটি দিয়া ছন্নছাড়া কবিকে গৃহের লতা শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিলাম। যে হাসিটির বিনিময়ে আকাশের চাঁদ হইতে, সন্ধ্যা-সকালের রঙিন মেঘ হইতে নুড়ি পাথর কুড়াইয়া আপন বুকের স্নেহমমতায় শিশু কুসুমগুলি গড়িয়া কবির কোলে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। সেই হাসি এখনও তাঁহার মুখ হইতে ম্লান হইয়া যায় নাই।

রোগগ্রস্ত কবি প্রায় অধিকাংশ সময় ভাবীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পুরাতন পুস্তকের পাতা উল্টাইতে থাকেন। হায়রে, কবির অতীত জীবন-নাট্যের বিস্মৃত পাতাগুলি আর কি তাহার কাছে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিবে?